অমর মরণ

(অভিনব কিশোর উপন্যাস)

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

বেংগল পাবলিশার্স
১৪, বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই লেখকের লেখা কিশোর সাহিত্য :

হে বীর কিশোর

ঘরছাড়া দিকহারা

কিশোর সংঘ (নিঃশেষিত)

ভূতের গল্প নয়

পথিক মানুষ (নিঃশেষিত)

দুর্লভ শা'র বাড়ী

রূপ-কাহিনী

শীগ্‌গির বের হবে :

দুঃখের দারুণ দীপ

নতুন যুগের রূপকথা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫২

মূল্য—এক টাকা

বেংগল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪, বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
ও মানসী প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত কালিদাস চৌধুরী.

অসেচনকেষু

২০শে বৈশাখ.

৮৫ রবীন্দ্রাব্দ

বিগত অগাষ্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় বাংলার একটি পল্লীর কয়েকটি জাগ্রত কিশোর প্রাণের আশা, আকাংখা, স্বপ্ন ও সংগ্রাম এই উপন্যাসের বিষয়-বস্তু। ইহার ঘটনা-কাল ভাদ্র—অগ্রহায়ণ, ৮২ রবীন্দ্রাব্দ।

মফস্বল সহরের সঙ্গীহীন ঘরে যখন এই উপন্যাস রচনায় হাত দেই, সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী সাহা এম্-এ বি টি তখন সহানুভূতি ও উৎসাহ দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। গ্রন্থ-প্রকাশের শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ চিত্তে সে-কথা স্মরণ করি।

'অমর মরণ'-এর পাণ্ডুলিপি দীর্ঘদিন কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার রাহুগ্রস্ত ছিল। বেংগল পাবলিশার্সের উদ্যোগী কর্মী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ স্বয়ং-প্রণোদিত হয়ে একে রাহুমুক্ত করেছেন। তাই এর ভবিষ্যতের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত। তাঁর শুভেচ্ছা সাফল্যমণ্ডিত হোক।

শ্রীমঃ

২০শে বৈশাখ—
৮৫ রবীন্দ্রাব্দ
১২/১, নাথের বাগান
কলিকাতা

অমর মরণ

'জয়রথ'

সোনার বাঙ্‌লা কাদের ?

আমাদের।

এ-দেশ রক্ষা করবে কারা ?

আমরা।

অন্য বাসনা নাই, নাই অন্য সাধনা। তরুণ বাঙ্‌লার সকল কামনা, সব সাধনা উদ্বেল হয়ে ছুটেছে একটি লক্ষ্যের পানে। সে-লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা। পরাধীনতার অক্টোপাশের কবলে আবদ্ধ হয়ে দেশ আজ শ্রীহীন, বিবর্ণ, মৃতপ্রায়। কালি হয়ে গেছে তাঁর সোনার অংগ। মিলিয়ে গেছে তাঁর ঠোটের হাসি। ফিরিয়ে আনতে হবে সেই হাসি। বিবর্ণ অংগে ফুটিয়ে তুলতে হবে সুবর্ণ-রাগ। আনতে হবে দেশের মুক্তি। তরুণ বাঙ্‌লার এই একমাত্র স্বপ্ন। এই একমাত্র সাধনা। এই স্বপ্নে জেগেছে বাঙ্‌লার অগুন্‌তি তরুণ প্রাণ। ১৩৪৯ সাল দেশের বুকে এনেছে উন্মত্ত জোয়ার।

তারি ঢেউ লেগেছে হলুদবাড়ীর কিশোর প্রাণে। ছেলেদের

খেয়াল খুসী দিয়ে গড়া সংঘ 'জয়রথ' নতুন উদ্যমে নেমেছে দেশের মুক্তি-যাত্রায়। রথীবৃন্দের মনে সীমাহীন উৎসাহ। সকাল-বিকেল বৈঠক বসছে। সভা হচ্ছে। শোভাযাত্রা চলেছে। হলুদবাড়ীর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে সমবেত কণ্ঠের রণ-সংগীত :

সোনার বাঙ্‌লা কাদের ?

আমাদের।

এ-দেশ রক্ষা করবে কারা ?

আমরা।

অপরাহ্ণের সূর্য পুকুর পাড়ের বাঁশবনের মাথায় ঢলে পড়েছে নারকেল গাছের লম্বা ছায়াগুলি ঘাসে-ঢাকা মাঠের উপর শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে যেন। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের মাথায় মাথায় আলোর ঝালর দুলছে ঈষৎ বাতাসে।

পড়ার-ঘরের জানালা দিয়ে রণধীর সেই দিকেই চেয়েছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল ও বাড়ী এসেছে। কলকাতায় স্কুলে পড়ে। ধর্মঘটের ফলে স্কুল বন্ধ। তার উপর দাদুর তাগিদ-পত্র। বাধ্য হয়ে রণধীর কলকাতা থেকে বাড়ী ফিরেছে। নইলে ওর ইচ্ছা ছিল না এ-সময় কলকাতা ছাড়বার। পথে পথে ছাত্রদের শোভাযাত্রা এখানে-ওখানে-সর্বত্র ইলেক্‌ট্রিকের তার কাটা, ট্রামে অগ্নি-সংযোগ স্যুটধারী বাবুদের টুপী নিয়ে বহ্নি-উৎসব। পুলিশের গ্রেপ্তার লাঠিচার্জ, গুলীবর্ষণ। সর্বত্র একটা উন্মাদ চাঞ্চল্য, মহানগরী নাড়ীতে নাড়ীতে ফুটন্ত রক্ত-ধারার বিক্ষুব্ধ নর্তন! এ-সব ফেলে কি ভাল লাগে হলুদবাড়ীর ঘুমিয়ে-পড়া পল্লী-জীবন! কোথায় বিরা

গত, কোথায় বিচিত্র কলকাতা, আর কোথায় সংকীর্ণ আত্মসর্বস্ব লুদবাড়ী !

সহসা রণধীরের কানে এল বহু কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি :

সোনার বাঙলা কাদের ?

আমাদের।

চমকে উঠল রণধীর। ঘুমানো পল্লী কি তবে জেগেছে ? এখানেও কি লেগেছে বিশ্ব-চাঞ্চল্যের দোলা ?

দৌড়ে রণধীর বাইরে এল। একদল কিশোর ছেলে চলেছে পথ বয়ে। অগ্রগামী দুটি বালকের হাতে লাল সালুর উপর তুলো দিয়ে মোটা হরপে লেখা পরিচয়-লিপি 'জয়রথ'। পিছনে শোভাযাত্রা। প্রত্যেকের হাতে বাঁশের লাঠি। চোখে স্বপ্ন। পদক্ষেপে বিজয়ীর দৃঢ়তা। কণ্ঠে পাঞ্চজন্যের দৃপ্ত নিনাদ।

রণধীর পথে এসে দাঁড়াল। শোভাযাত্রা প্রায় পৌঁছে গেছে। র হতেই-সেবাব্রত সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আরে, এই তো রনু এসে গেছে। কখন এলে তুমি ?

রনধীর জবাব দিল : এই তো এলাম, দুপুরের গাড়ীতে।

ও-পাশ থেকে স্বরাজ বলল : তোমার অভাবটা এ কয়দিন কী ভাবে যে feel করছিলাম, সে আর কি বলব। তুমি হলে জয়রথে'-র প্রথম ও প্রধান রথী।

মৃদু হেসে রনধীর বলল : সত্যি, ভারী খুসী হয়েছি তোমাদের এই নব জাগরণ দেখে। এরি মধ্যে আমাদের 'জয়রথ' যে এতটা এগিয়ে গেছে, তা ভাবতে পারি নি। কলকাতায় যা দেখে এলাম, সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

চঞ্চল শোভাযাত্রা ইতিমধ্যেই থেমে গিয়েছিল। রোমাঞ্চকর কিছু শোনবার আশায় সবাই এবার উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

স্বরাজ জিজ্ঞাসা করল : কী দেখে এলে ? কলকাতায় বুঝি ভারী যুদ্ধ হচ্ছে পথে পথে ? শুনলাম, মেসিন-গান থেকে নাকি গুলী চালাচ্ছে সৈন্যরা,—

হেসে বাধা দিল রনধীর : সে সব অনেক কথা। পরে বলব। এখন তোমরা শোভাযাত্রা চালাও। আমি এক্ষুনি আসছি জামাটা নিয়ে।

বাধা পেয়ে স্বরাজ ক্ষুব্ধ হল। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে সে চীৎকার করে উঠল : সোনার বাঙ্‌লা কাদের ?

শত কিশোর-কণ্ঠে উচ্চারিত হল উত্তর : আমাদের।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল।

বারোয়ারী কালী-মণ্ডপে সভা বসেছে। বিগ্রহের উঁচু বেদীর উপর পাঁচ-ছয়টা হ্যারিকেন বসিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একপাশে বাতি-দানে জ্বলছে তেলের প্রদীপ। ধূপ্‌তির প্রচুর ধূপের গন্ধে ঘর আমোদিত। খানিক আগেই দেবীর সন্ধ্যারতি হয়ে গেছে।

আজকের সভা একটু বিশেষ রকমের। শুধু কিশোর-তরুণরাই নয়, হলুদবাড়ী গাঁয়ের বয়স্ক মাতব্বর লোকদেরও আজ সভায় ডাকা হয়েছে। প্রবীন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতখুড়ো, সুবল সাধু, হেমন্ত ডাক্তার আর এ-গাঁয়ের সবচেয়ে বিত্তশালী জাঁহাবাজ জোত্‌দার-বৃদ্ধ সরকার মশায় হতে আরম্ভ করে সম্পন্ন কৃষি-গৃহস্থ ইয়াসিন খাঁ,

নাম-করা লেঠেল অক্রূর সর্দার আর মামলাবাজ নিতাই পাল প্রভৃতি সবাই আজ সভায় উপস্থিত। আজকের সভা গুরুতর।

গলা খাঁকারি দিয়ে প্রথমে কথা বলল সেবাব্রত: আপনাদের সকলের অনুমতি নিয়ে এইবার তা হলে সভার কায আরম্ভ করা যাক।

সকলে সশব্দে সম্মতি দিলেন। সেবাব্রত বলল: প্রথমেই আমি প্রস্তাব করছি যে, আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বনমালী সরকার মশায় আজকের সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করুন।

সংগে সংগে স্বরাজ বলল: আমি এ-প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

সশব্দ কলরবের মধ্যে বৃদ্ধ সরকার মশায় যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকেই সবিনয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন সভার উদ্দেশ্যে। সেবাব্রত আবার বলতে সুরু করল: আমাদের দেশ আজ এক বিষম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। যে বিরাট ধ্বংস-যজ্ঞের লেলিহান শিখায় ইউরোপের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, তার ছোঁয়াচ আজ লেগেছে আমাদের ঘরের চালে। যুদ্ধ আজ মহাদেশের সীমা অতিক্রম করে আমাদের গৃহদ্বারে প্রলয় নৃত্য সুরু করেছে। ব্রহ্মদেশ যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে। আসামের সীমান্ত-রেখা বারুদের স্তূপে রূপান্তরিত হয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে প্রলয়ংকর সংগ্রাম সুরু হবে আমাদেরই আঙিনায়।

এক নিশ্বাসে এতখানি বলে সেবাব্রত একটু থামল। ও-পাশ থেকে নিতাই পাল বলল: এ-সব কথা তো রোজই পড়ছি খবরের কাগজে, কিন্তু আমাদের সভার উদ্দেশ্য কি সেই কথাই আমরা আগে শুনতে চাই।

রুষ্ট কটাক্ষে সেদিকে একবার চেয়ে সেবাব্রত বলল সেই কথাই বলছি। চারিদিকে যখন এই অবস্থা, তখন আর আমরা ঘরের কোণে নিশ্চিন্তে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। শুধু খবরের কাগজে যুদ্ধের তাজা খবর পড়ে গরম গরম আলোচনায় আর আমরা দিন কাটাতে পারি না। আমাদেরও এই আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বিশ্বব্যাপী এই ভাঙা-গড়ার সন্ধিক্ষণেই আমাদের কায গুছিয়ে নিতে হবে। দেশের স্বাধীনতা আমরা চাই কিন্তু শুধু চাইলেই তো হবে না। তার জন্যে চাই প্রস্তুতি। চাই আয়োজন। তারি ব্যবস্থা করবার জন্যেই আজকের এই সভা।

ছেলেরা সশব্দে করতালি দিয়ে উঠল। সেবাব্রত থামল। চমৎকার বলতে পারে ও। এরি মধ্যে কেমন একটা গম্ভীর থমথমে ভাব এসেছে সভায়। সকলেরই মুখে চোখে একটা গভীর উত্তেজনার রেখা উঠেছে ফুটে।

মৃদু হেসে সরকার মশায় বললেন বেশ, তোমরাই বলো, কি ব্যবস্থা তোমরা করতে চাও?

চারিদিকে মৃদু গুঞ্জন। পারস্পরিক আলাপের অস্পষ্ট ধ্বনি। কয়েকটি ছেলে সেবাব্রতকেই ঠেলে তুলে দিল আবার। বিজয়ী বক্তার ভংগীতে সে উঠে দাঁড়াল। উঠবার আগে রনধীর কি যেন বলে দিল তার কানে কানে, উপদেশের ভংগীতে। সেবাব্রত চারদিক চেয়ে বক্তৃতা সুরু করল। আমরা ছেলেমানুষ, অজ্ঞান, অনভিজ্ঞ। কাজেই কি ব্যবস্থা করা আমাদের উচিত, কোন কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য, সে বিচারের ভার আপনাদের। আমাদের ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে আমরা যা বুঝেছি, তাই এই সভায় উপস্থিত করব মাত্র।

একটু দম নিয়ে রনধীরের দিকে একটু চেয়ে সে বলল : আমি বলতে চাই, দেশের মুক্তি আমাদের লক্ষ্য। সে-মুক্তি অর্জন করতে হবে নিজেদের সামর্থ্যে, ভিক্ষা করে নয়। সুতরাং মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ যুদ্ধ। আর যুদ্ধের জন্য সর্বপ্রধান প্রয়োজন সৈনিক।

অদ্ভূত বলবার ভংগী। কালী-মণ্ডপ স্তব্ধ। বাইরে কৃষ্ণাতিথির কালো রাত। মেঘে মেঘে তারার আলোও নিশ্চিহ্ন। আকাশ ও ধরণী একাকার করে নেমেছে গাঢ় অন্ধকার।

আপনারা জানেন, সৈনিক তৈরী করতে, সেনাবাহিনী গঠন করতে দুটি জিনিষের প্রয়োজন অনিবার্য। প্রথমতঃ সুস্থদেহ ত্যাগব্রতী মানুষ। সে-মানুষ যে বাঙলায় আছে, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত বীর কিশোরের অভাব যে বাঙলায় নাই, আমাদের সংঘ এই 'জয়রথ'-ই তার প্রমাণ। এই 'জয়রথ' শুধু হলুদবাড়ীর বুকেই তার অভিযান স্থরু করে নাই। বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে গড়ে উঠেছে এমনি অসংখ্য জয়রথ। সুতরাং স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেনানী হবার মত মানুষ আমরা পাব। এইবার দ্বিতীয় প্রয়োজন। সে প্রয়োজন অস্ত্রের। প্রত্যেক মানুষের হাতে তুলে দিতে হবে হাতিয়ার। কিন্তু কোথায় সে অস্ত্র? কোথায় হাতিয়ার?

ও-পাশ থেকে হেমন্ত ডাক্তার ফোড়ন কাটলেন : আস্তে বাবা, আস্তে। কপ্‌চাচ্ছ তো খুব—অস্ত্র, হাতিয়ার, যুদ্ধ—অনেক কিছু। বলি ভারত রক্ষা আইনের কথাটা কি ভুলেই মেরে দিয়েছ? অস্ত্র অস্ত্র যে করছ বড়, অস্ত্র দিচ্ছে কে তোমার হাতে?

ডাক্তারের অশিষ্ট টিপ্পনিতে স্বরাজ ক্ষেপে গেল, বলল : সে-ভাবনা

আপনাকে ভাবতে হবে না। টিউব-ওয়েলের জলে দাগ কেটে সহস্রমারী চিকিৎসক হবার তালে আছেন, তাই করুনগে। কপচাই আর লাফাই—সে খোঁজে আপনার কায নাই।

হেমন্ত ডাক্তার হেঁ-হেঁ করে উঠলেন: শুনলেন সরকার মশায়, শুনলেন আপনারা সকলে। না-হক আমার অপমানটা শুনলেন। আমিও হেমন্ত ডাক্তার, জল বেচে খাই। এর শোধ আমি তুলবো না! হুঃ, মামার হোটেলে খায়, আর রাতদিন কুঁদি করে ফেরে। এদিকে মামার ভিটেমাটি যে দেনার দায়ে বাঁধা, সে-খবর রাখে না। দেখে নেব—দেখে নেব আমি। - হুঃ—

রাগে কাঁপতে কাঁপতে হেমন্ত ডাক্তার লাঠি নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, সরকার মশায় তাঁকে ধরে বসালেন: আরে বসো ডাক্তার, বসো। ছেলে মানুষ রাগের মাথায় একটা কথা বলে ফেলেছে, তার কি অত মানে ধরতে আছে।

হেমন্ত ডাক্তার গর-গর্ করতে করতে বসলেন। সরকার মশায় মৃদু হেসে বললেন: তোমারও এটা কিন্তু ঠিক হয়নি স্বরাজ। গ্রামের একজন মান্যিমান লোক, তাঁকে দশজনের সামনে এমন কথা বলা তোমার অন্যায়ই হয়েছে।

ধুয়া ধরল নিতাই পাল: অন্যায়—একশো বার অন্যায়। কথায় বলে মানী লোকের মান! তাছাড়া—তোমরাই ভেবে দেখ বাবা সকল, অলেহ্য কথা ডাক্তারবাবু কিছু বলেন নি। সত্যি তো, অস্ত্র চাই বললেই তো আর হুট করে ঢাল-তলোয়ার কামান-বন্দুক সব চলে আসবে না। পরাধীন জাত আমরা, অস্ত্রধারণ নিষেধ। কোথায় পাচ্ছ তোমরা অস্ত্র, যে সৈনিক সাজবে, বাহিনী গড়বে?

সেবাব্রত ততক্ষণ বসে পড়েছে। এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে উঠে দাঁড়াল রনধীর। একে বনমালী সরকার মশায়ের আদরের পৌত্র—সরকার-বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী, তায় কলকাতায় ইংরেজী স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র, হলুদবাড়ী গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সকলেই রনধীরকে সমীহ করে চলে। উপস্থিত শ্রোতারা একটা কথার মতো কথা শোনবার জন্য কান খাড়া করল।

রনধীর থেমে থেমে বলতে লাগল: ভারতরক্ষা আইনের খবর আমরা রাখি। অস্ত্র-আইনও জানি। সব জেনে শুনেই এ-কাজে আমরা হাত দিয়েছি। শুনুন তবে বলছি আমাদের প্রস্তাব। কামান-বন্দুক আমরা পাব না। গোলা-বারুদ আমাদের হাতের বাইরে। কিন্তু আমাদের দেশী অস্ত্র-শস্ত্রের উপর তো কোন সরকারী আইন জারী হয় নাই। আমাদের দা আছে, শড়কি আছে, কোঁচ আছে, রাখ্‌শা আছে। তার চেয়েও হাতের কাছে আছে ধনুক-তীর, গুলী-বাঁশ...আর ছোপের পাকা বাঁশের লাঠি। এ-সব অস্ত্র তো আমাদের হাতের মুঠোয়। এ-নিয়ে তো আমরা নিজেদের শক্তি বাড়াতে পারি। সংঘবদ্ধ হয়ে দুর্জয় শক্তি অর্জন করতে পারি।

কথা বলল নিতাই পাল: এ-কথা তুমি যা বলেছ বাবাজী, এ একেবারে নিছক খাঁটি কথা। কিন্তু বাবাজী, তীর-ধনুক গুলী-বাঁশ আর লাঠি চালিয়ে বড় জোর হাটুরে কাজিয়া মাত্ করতে পার। কিন্তু এ-যুগে যুদ্ধটা বড় বেয়াড়া। শত্রু আসবে ট্যাংক-টর্পেডো-বম্বার নিয়ে, গোলা-গুলীর ছড়াছড়ি লাগিয়ে দেবে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। তোমার ও স্বদেশী সৈন্য নিয়ে তুমি দাঁড়াবে কোথায় বলতো বাবাজী?

এক-হাত-নেওয়া গোছের গাল-ভরা হাসি হেসে উঠল নিতাই পাল। পাল্টা জবাব দিল রনধীর: আপনি তো দেখি খুব খবরের কাগজ পড়েন। ট্যাংক-টর্পেডো-বম্বারের খবরও রাখেন। অথচ সংঘবদ্ধ গণশক্তি যে নামমাত্র অস্ত্র নিয়ে কত শক্তিশালী হতে পারে তার খোঁজ রাখেন না। মহাচীনের গরিলা-বাহিনীর অসাধ্য সাধনের কথা কি খবরের কাগজে পড়েন নি কোন দিন? আবিসিনিয়ার অশিক্ষিত হাব্‌সীদের হাতে কত ট্যাংক-টর্পেডো ছিল?

রনধীরের প্রত্যক্ষ আঘাতের টাল সামলাতে না পেরে নিতাই পাল আমতা আমতা করে বলল: না না, তা বলছি না, সে কথা নয়,—

আবার সুরু করল রনধীর: যাক সে-সব অনেক দূরের, সাগর-পারের কথা। কিন্তু বাঙালীর হাতের কব্জির জোরে একদিন পাকা বাঁশের লাঠিতে যে ভেল্‌কী খেলত, তাও কি ভুলে গেছেন?

নিতাই পাল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত: না না, তা ভুলব কেন? সে-কথা কি ভোলা যায়?

রনধীর দৃপ্তকণ্ঠে বলল: সে গৌরব-কাহিনী ভুলেছেন বলেই বাঙলার লাঠির প্রতি আপনার এই অশ্রদ্ধা। কিন্তু আমরা আনব বাঙলার সেই হারানো দিন। কিশোর বাঙালী নতুন করে লিখবে বাঙলার লাঠি-শড়্‌কির বীরত্ব-গাথা।

সুবল সাধু এতক্ষণ চুপটি মেরে বসে ছিল এক পাশে। ভাবাবেশে এবার সে চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ: সাবাস ভাই, সাবাস। ফুল-চন্দন পড়ুক তোমার মুখে। তোমার এ-কথা আমি একদিন সুর দিয়ে গেয়ে তোমায় শুনিয়ে যাব।

সুবল সাধু বৈরাগী মানুষ। চমৎকার গান গায়। ছোট-বড় সব মহলেই তার আনাগোনা। স্বভাব আমুদে মানুষ। ফুলের বাগিচায় ঘেরা ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরে থাকে। নিজেই ছড়া বাঁধে। তাই সুর দিয়ে একতারা বাজিয়ে গায় আর বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে। হাসিমুখে যে যা দেয় তাতেই তার দিন চলে।

সাধুর কথায় সরকার মশায় মৃদু হেসে বললেন : সে তুমি একদিন ছেড়ে দশদিন এসে শুনিও সাধু। কিন্তু এদিকে যে রাত্ ক্রমেই বেড়ে চলেছে হে সেবাব্রত। শুধু আজে বাজে তর্ক-বিতর্কই তো করছ, তোমাদের এ-সভার আসল উদ্দেশ্যটা কি তাই বলো খোলসা করে।

রনধীরের ইংগিতে সেবাব্রত আবার উঠে দাঁড়াল। বলল : আমরা চাই এই সব দেশী অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে যোগাড় করে প্রত্যেক ছেলেকে তার ব্যবহার শেখাতে। আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমাদের 'জয়-রথে'র জন্য রথী সংগ্রহ করতে। আর—

সেবাব্রতের কথার মাঝখানেই সরকার মশায় বললেন : অর্থাৎ তোমরা চাও একটা আখড়া তৈরী করতে এবং সেঁখানে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা এই সব শেখাতে, কেমন তো ?

কি যে ওরা গড়ে তুলতে চায়, সেবাব্রতের নিজেরি সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। কোন মতে ও জবাব দিল আজ্ঞে, অনেকটা তাই। তবে ঠিক তা নয়। আমাদের আদর্শ আরো বড়। আমরা চাই দেশ জুড়ে এমনি অনেক 'জয়রথ' গড়তে। অনেক রথী আমাদের চাই। স্বাধীনতা-যুদ্ধের অনেক সৈনিক।

সরকার মশায়ের ঠোঁটে মৃদু হাসি। রসিকতাভরে তিনি বললেন

বেশ, বেশ। না হয় তাই হলো। বেশ তো, তাই করো। অনেক 'জয়রথ' তোমরা চালাও। অনেক রথী তোমরা জোগাড় করো। অনেক সৈনিক তোমরা সাজো। খুব ভাল, খুব ভাল কথা। আমরা তাতে সানন্দে সম্মতি দিলাম।

কথা বলল স্বরাজ: কিন্তু তার জন্যে আমাদের টাকার দরকার, আর সেই টাকার ব্যবস্থার জন্যেই এই সভা ডাকা হয়েছে

হেমন্ত ডাক্তার আঁতকে উঠলেন: টা—কা!

সরকার মশায়ের চোখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল। ঠোঁটে গাম্ভীর্যের ছায়া ফেলে তিনি বললেন: টাকা? টাকা দিয়ে কি হবে?

স্বরাজ ডানপিটে ছেলে, বলল: আজ্ঞে, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। কতক কিনতে হবে, কতক তৈরী করতে হবে। তার জন্যে টাকার দরকার।

সরকার মশায় ব্যংগের সুরে বললেন: কেন? বানাবে তো কয়েক গাছা লাঠি আর গোটাকত গুলী-বাঁশ। তার আবার টাকা লাগবে কোন্ কমে?

বিনীতভাবে জবাব দিল সেবাব্রত: আজ্ঞে শুধু লাঠি-সোটায় তো কাজ হবে না। আমরা বিশেষ করে জোর দিতে চাই দা, শড়্‌কি, রাখ্‌শা প্রভৃতি অস্ত্রের উপর। কারণ প্রকৃত সংগ্রাম যখন সুরু হবে, তখন লৌহ-অস্ত্র না হলে আমরা দাঁড়াব কিসের বলে?

সুবল সাধু সোৎসাহে বলল: এ কথাটা বেশ বলেছ ভাই। অস্ত্র মানেই তো লোহা অর্থাৎ ইস্পাত্। আরে ভাই, বিশ্‌করম্ ঠাকুর না হলে কি আর ভাঙা-গড়ার কায চলে!

সরকার মশায় সাধুর কথায় কান দিলেন না, সোজা জিজ্ঞাসা

করলেন : বেশ, যা তোমাদের খুসী তাই করগে। তা, আমাকে তার কি করতে হবে ? আমাকে কেন ডেকেছ তোমাদের সভায় ?

সেবাব্রত তেমনি মৃদু সকুণ্ঠ কণ্ঠে বলল : আজ্ঞে, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের প্রয়োজনীয় টাকাটা আপনি আমাদের দান—

সেবাব্রতের কথা শেষ হল না। সরকার মশায় হুংকার দিয়ে উঠলেন : কেন ? আমি কেন দেব টাকা ? তোমরা সবাই মিলে সমিতি করবে, সবাই টাকা দাও।

উত্তরে সেবাব্রত বলল : আমরা সাধ্যমত যে যা পেরেছি দিয়েছি এবং দেব-ও। কিন্তু এ-কাযে যে অনেক টাকার দরকার, অত টাকা আমরা কোথায় পাব ?

কত টাকা তোমাদের দরকার শুনি ?

আজ্ঞে, দরকার তো অনেক টাকার। তবে আপনার কাছ থেকে আমরা পঞ্চাশটা টাকাই আশা করি।

সরকার মশায় সশব্দে ফেটে পড়লেন : পঞ্চাশ টাকা ? খেলা পেয়েছ ? পঞ্চাশ টাকা যেন গাছের ফল। ঝাঁকি দিলেই টুপ করে হাতে এসে পড়বে। দেব না আমি টাকা, এক পয়সাও না।

ছেলের দল হতাশ নয়নে রণধীরের দিকে চাইল। রণধীরের মুখও লজ্জায় বেদনায় কালো হয়ে উঠেছে। দাদু ইচ্ছা করলেই এ টাকাটা দিতে পারেন। সেই ভরসাতে ওরি প্রস্তাবক্রমে সেবাব্রত কথাটা পেড়েছে। কিন্তু দাদু যে এমন করে না করে বসবেন, সকলের সামনে ওর মাথাটা মাটিতে নুইয়ে দেবেন, তা যে ও ভাবতেও পারে নি। এখন উপায় ?

সেবাব্রত তবু কথা বলল শেষ চেষ্টায় : কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন —টাকাটা আপনি না দিলে যে আমাদের 'জয়রথ'ই চলতে পারে না।

নাই বা চলল তোমাদের রথ। তাতে আমার কি? আমি টাকা দিতে পারব না।

পাশ থেকে পণ্ডিত খুড়ো নড়ে উঠলেন, বললেন : 'আমার কি' বলো না হে বনমালী, তোমার অনেক কিছুই।'

পণ্ডিত খুড়ো গ্রামের তিন পুরুষের খুড়ো। ঠাকুরদা, বাবা এবং নাতি সবারি সংগে তার একই সম্পর্ক। সবাই এই সদালাপী স্বাধীনচেতা বৃদ্ধ মানুষটিকে সমীহ করে চলে।

সরকার মশায় বিরক্ত কণ্ঠে বললেন : তুমি কি বলছ খুড়ো ?

খুড়ো মৃদু মৃদু হেসে বলতে লাগলেন : ঠিকই বলছি বাপু, একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখো। ছেলেপিলেরা অবশ্যি উত্তেজনার মাথায় যুদ্ধ-বিগ্রহ, কামান-বন্দুক, স্বদেশী সেনা এমনি অনেক কথাই বলল। এ-সব কতদূর কি কাযে ফলবে, তা একালের ছেলে ছোকরা, ওরাই বোঝে ভাল। কিন্তু একটা কথা ঠিকই জেনো বাপু, জাপানী বোমা আমাদের ঘাড়ে পড়ুক আর নাই পড়ুক, চারিদিকে যে-রকম ডামাডোল বেঁধে উঠেছে, তাতে চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামী, লুট-তরাজ যে হু হু করে দেখা দিতে পারে, তাতে কিন্তু কোন সন্দেহ নাই। আর সেই দুর্দিনে এই ছেলেরা যদি বুক দিয়ে না দাঁড়ায়, তা'হলে তোমার ও ঠাকুর-মণ্ডপও থাকবে না, সাধের আটচালা কাচারী বাড়ীও থাকবে না।

ছেলেরা মহা উল্লাসে করতালি দিয়ে উঠল। বয়স্কেরা হতবাক। স্বরাজ দরাজ গলায় চেঁচিয়ে উঠল: ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। সকলের কণ্ঠে উঠল প্রতিধ্বনি . ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

পণ্ডিত খুড়োর চোখে-মুখে কিন্তু উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নাই। ঠোঁটে তার তেমনি মৃদু হাসি। আবার বললেন সরকার মশায়ের দিকে চেয়ে · দেখো হে বনমালী, দাঁড়কাকের মত চালের খড়ে মাথা গুঁজে নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো না। দিনকালের হাওয়া দেখেশুনে চলো। ছেলেরা যখন মিলেমিশে করতে চাচ্ছে একটা কায, তখন ও কয়টা টাকা তুমি দিয়ে দাও ওদের।

টাকা সরকার মশায়ের বুকের রক্ত। প্রতিটি টাকা বের হতে তার হৃৎপিণ্ডে যেন টান লাগে। কিন্তু সভার অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে অন্য পথও তো নাই। অগত্যা তিনি বললেন মুখ কালো করে আচ্ছা যাও। তোমরা যখন বলছ, দেব আমি দশটা টাকা তোমাদের ফণ্ডে।

ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠল। সরকার মশায়ের সম্মতিতে তাদের সাহস ও উৎসাহ গেছে বেড়ে। সকলে একবাক্যে জানাল দশটাকা আমরা নেব না, পঞ্চাশ টাকা আমরা চাই।

সভা হাট হয়ে উঠল বাক্‌বিতণ্ডায়-গোলযাগে। সরকার মশায় যত বলেন, দশ টাকার বেশী আমি দেব না, ছেলেরা তত দাবী জানায়, পঞ্চাশ টাকার কম আমরা নেব না। ক্রমে বয়স্কদের মধ্যেও অনেকে ছেলেদের দলে হেলল। সত্যি তো, রায় মশায় বড়লোক : লুট-তরাজ দাংগা-হাংগামা হলে তাঁর বাড়ীর উপরেই প্রথম ঝড় বইবে : এই সামান্য কয়টা টাকা তো তাঁরি দেওয়া উচিত।

সরকার মশায় রেগে টং : কেন? আমি কেন দিতে যাব সব টাকা? বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সকলেরই আছে। সকলেই হার করে চাঁদা তুলে ছেলেদের খেয়াল মেটাক। আমার টাকা আছে বলেই বুঝি তা জলে ভাসিয়ে দিতে হবে!

হেসে বললেন পণ্ডিত খুড়ো : জলে নয় হে বনমালী, এ-টাকা তুমি সার-মাটিতে পুঁতছ। ভগবান না করুন, দুঃসময় যদি সত্যি আসে, এই পঞ্চাশ টাকা তোমার পাঁচশো টাকার কায করবে।

কিন্তু সরকার মশায় অনড়। বললেন; তুমি থামো তো খুড়ো। সব সময় তোমার ওই মিঠিয়ে মিঠিয়ে কথা ভাল লাগে না। দেব না আমি টাকা, কিছুতেই দেব না। এক পয়সাও দেব না।

কালী-মণ্ডপের বাইরে অন্ধকারের ভিতর হতে কে যেন বলে উঠল : সাইলক দি য্যু।

মুহূর্তে সভার মধ্যে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন উঠল। যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে সরকার মশায় মাথা তুলে গর্জে উঠলেন কে? কে? কে ওখানে?

কেউ কোথাও নাই। যে-দিক থেকে কথাটা এসেছিল, সেখানে শুধু বোবা অন্ধকার। হ্যারিকেনের আলোয় খোঁজ করে সেখানে মানুষের চিহ্নও পাওয়া গেল না।

সরকার মশায় আহত কণ্ঠে বললেন : সভায় ডেকে এনে আমাকে অপমান! আমি হলাম সাইলক। টাকার দায়ে মানুষের বুকের মাংস কেটে আমি খাই। বেশ তাই হোক। আজ থেকে আর তোমাদের কোন সভা-সমিতিতেই আমি নেই। এক পয়সাও আমি দেব না আর।

ছেলেরা বুঝল, গতিক সুবিধার নয়। সরকার মশায়ের ক্রুদ্ধ গর্জন যে এমন ভাবে থেমে গেল, এই যথেষ্ট ভাগ্যের কথা। এ নিয়ে আর টানাটানি করে লাভ নাই। সেবাব্রতই হাত জোড় করে বলল: বেশ, টাকা না হয় আপনি নাই দিলেন। কিন্তু আমাদের উপর রাগ করে আপনি যেতে পারবেন না কিছুতেই। কে যে অলক্ষ্যে থেকে আপনার অপমান করেছে, আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা তা জানি না। সে যেই হোক, এই অপরাধের জন্যে 'জয়রথে'-র পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। বলুন, আপনি আমাদের ক্ষমা করলেন?

সরকার মশায়ের কানে তখনো বাজছে তীক্ষ্ণ ব্যংগোক্তি: সাইলক দি য়্যু। তিনি চুপ করে রইলেন। জবাব দিলেন না সেবাব্রতের মিনতির।

সরকার মশায়ের এ-স্তব্ধতার অর্থ ছেলেরা জানে। প্রলয়ের এ পূর্বাভাষ। ক্ষণকাল পূর্বের যে ক্রুদ্ধ গর্জন অকস্মাৎ খাদে নেমে এসেছিল, সেখানেই যে তার সমাপ্তি হয় নাই, এ স্তব্ধতা তারি পরিচয়। ছেলেরা প্রমাদ গুণল। সরকার মশায়ের রাগ থামাতে না পারলে, হলুদবাড়ীতে 'জয়রথে'র চাকা অচল হয়ে যাবেই। কেউ তাকে চালাতে পারবে না। দুর্দান্ত জোতদার বনমালী সরকার। প্রচণ্ড তাঁর শক্তি। তীক্ষ্ণ তাঁর কূটবুদ্ধি। তাঁর রোষ-বহ্নি না নিভলে 'জয়রথ' পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ছেলেদের মুখ শুকিয়ে গেল। কাতরকণ্ঠে সেবাব্রত বলল: বলুন আপনি আমাদের ক্ষমা করলেন?

গম্ভীর গলায় জবাব এল: সাইলকের আবার ক্ষমা কি? সে তো নরমাংস খায়।

বয়স্করাও এবার চমকে উঠল। সভা বজ্রাহতের মত স্তব্ধ। কালো রাত থম্ থম্ করছে। কারো মুখে কথা নাই। চোখে বুঝি নাই পলকপাত।

সরকার মশায় বললেন : আচ্ছা, তাহলে উঠি। আজকের মত সভা এখানেই শেষ হল।

উঠতে যেয়ে তিনি লাঠিতে হাত দিলেন। অমনি পণ্ডিত খুড়ো এগিয়ে এসে তাঁর হাত চেপে ধরলেন : কি করছ তুমি বনমালী : এই সব দুধের ছেলের সাথে কি তোমার পাল্লা : শেষে তুমি এদের সংগে ঝগড়া করবে? পাগল নাকি!

: হাত ছাড়ো খুড়ো। তোমার মত মাছের রক্ত আমার নয়। আর পাল্লার কথা বলছ? আঘাত আঘাত, তা সে যেখান থেকেই আসুক। কপালের রক্তের দাগ বাঁ হাতে মুছে দাঁত বের করে হাসবার ধাত আমার নয়, সে আমি পারব না। তুমি হাত ছাড়ো।

হাত একরকম ঠেলে দিয়েই সরকার মশায় উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে।

রণধীর এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল এক পাশে। এক দিকে দাদুর অপমান, অন্যদিকে 'জয়রথে'-র ভীষণ ভবিষ্যৎ—দুই তরংগের মাঝে রণধীর দিশেহারা। কী সে করবে? কেমন করে রক্ষা করবে তার অনেক স্বপ্ন দিয়ে গড়া এই 'জয়রথ'। এ যে ওর বুকের রক্ত—প্রাণ হতে প্রিয়। শেষে ওরই নিকটতম আত্মীয়ের হাতে হবে তার অন্ত্যেষ্টি!

দাদুকে দাঁড়াতে দেখে ওর দেহের শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ

খেলে গেল। মাথার মধ্যে জেগে উঠল প্রলয়-ঝড়। হঠাৎ ও উঠে দাঁড়াল। কেন? তা ও নিজেই বুঝি জানে না। যেন স্বপ্নের ঘোর। নিজের অজ্ঞাতেই রণবীর দাদুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। দুই হাতে পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল : ওদের তুমি ক্ষমা করো দাদু—ক্ষমা করো—

পণ্ডিত খুড়োর চোখে-মুখে হাসি উঠল ঝলমলিয়ে। সরকার মশায় বিস্মিত, বাক্যহীন। একটু চুপ করে থেকে ধরা গলায় বললেন : আমার অপমানটা কি এতই হেয় জিনিষ—

বাধা দিল রণধীর : তোমার এ-অপমানের প্রতিকারের জন্যে দরকার হলে আমি নিজ হাতে 'জয়রথ'-কে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেব। কিন্তু একের অপরাধে তুমি সকলকে শাস্তি দিও না। আমাদের 'জয়রথ'-কে ভেঙো না।

: আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন পা তো ছাড়্—

: না, আগে বল তুমি ওদের ক্ষমা করেছ, নইলে কিছুতেই আমি পা ছাড়ব না।

পণ্ডিত খুড়ো ও-পাশ হ'তে বললেন : আমাদের লোহার হাত তুমি ঠেলে ফেলতে পার বনমালী, কিন্তু ও ননীর হাতের কাছে তোমার জারিজুরী চলবে না। দাদাভাই যখন ধরেছে, তখন এবারের মত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ।

সরকার মশায়ের বুকের তল হতে বেরিয়ে এল গভীর দীর্ঘশ্বাস। মনে পড়ল একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশয্যার স্মৃতি। মনে পড়ল এক বছরের শিশু রণধীরের ছবি। মনে পড়ল সেই শিশুর দীর্ঘ চতুর্দশ বছরের জীবনের নানা দিনের নানা বিস্মৃত-স্মৃতির কাহিনী। সরকার

মশায়ের চোখে বুঝি জল এল। বাঁ হাতে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন: বেশ। এবারেও তোরই জিত হোক। শোন হে সেবাব্রত, তোমাদের 'জয়রথে'-র উন্নতির জন্যে আমি পঞ্চাশ টাকা দান করলাম। কাল দুপুরে কাচারিতে গিয়ে টাকাটা নিয়ে এসো।

সেবাব্রত এগিয়ে এসে সরকার মশায়কে প্রণাম করল। সুবল সাধু সবাইকে ডেকে বলল: আমার গান শোনবার নেমন্তন্ন রইল আপনাদের সকলের—আসছে পূর্ণিমায় এই কালী-মণ্ডপে।

সকলে হেসে সম্মতি জানাল। সভা ভাঙল।

এলো সারথী

পরদিন বিকাল।

'জয়রথে'-র রথীরা এসে বসেছে গ্রামের বাইরে খালের ধারে। পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে সূর্যাস্তের আভায়। তারি রঙ্ ঝলমল করছে নিচে খরস্রোত খালের বুকে।

আলোচনার রেশ টেনে রণধীর বলল: কিছু কিছু ব্যবস্থা তো হলো। দশখান দশখান করে শড়্‌কি আর রাখ্‌শা এবং পঞ্চাশটা তীরের ফলা বানাতে দিয়েছি ভাটিপুরের কামারদের ওখানে। কুড়িটা গুলি-বাঁশের অর্ডার দিয়েছি জসিম ঘরামীর কাছে। চমৎকার গুলী-বাঁশ ও বানায়।

সেবাব্রত যোগ দিল কথায় : হাতের তাক-ও ওর চমৎকার। গুলীতে গুলীতে হড়ালী মারে রোজ নদীর ধারে।

রণধীর শুধাল : গুলী-বাঁশের গুলীর কি ব্যবস্থা তুমি করেছ সেবা ?

: সে তুমি যেমন বলেছ তেমনি ব্যবস্থা হয়েছে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের সব বলে দিয়েছি, এক হাজার করে আঁটালো মাটির গুলী বানিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলে এক আনা করে পয়সা পাবে। আর কথা কি ? মহা উৎসাহে সব কাযে লেগে গেছে।

বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতে একটা কীল মেরে স্বরাজ বলে উঠল : বাঃ, এ তো চমৎকার কথা। বাঙলার ঘরে ঘরে তৈরী হচ্ছে গোলা-গুলী। ন্যাশন্যাল ওয়ারের এ্যম্যুনিশন্স্ তৈরী হচ্ছে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিতে, চমৎকার আইডিয়া।

রণধীর কাযের কথাই ভাবছিল। বলল : বাকী রইল লাঠি। সে আমরা নিজেরাই করব। কাল স্নানের আগে সবাই হাজির হবে 'জয়রথে'। সংগে দা আনবে একখান করে। তারপর সবাই মিলে ঢুকবো বাঁশ-ঝোপে। জন প্রতি পাঁচখান করে পাকা লাঠি কাল কাটা চাই।

সকলে সম্মতি দিল : বেশ, তাই হবে।

একটু ভেবে রণধীর বলল : কিন্তু একটা বড় কাযই যে এখনো বাকী পড়ে আছে। অথচ তার ব্যবস্থা যে কি হবে, তাতো বুঝতে পারছি না।

সেবাব্রত শুধাল : কি কায রণু ?

: ঢাল তলোয়ারের আয়োজন তো করছি। কিন্তু ওস্তাদ পাওয়া যাবে কোথায় ? এ সব আমাদের দেখাবে কে ?

সত্যি তো, তীর-ধনুক, লাঠি-শড়কি হলেই তো হবে না। সে-সবের ব্যবহার শিখতে হবে তো।

রণধীর আপন মনেই বলল : আগে যদি জানতাম তোমরা এতদূর এগিয়েছ, তাহলে না হয় সমরেন্দ্রকে নিয়ে আসতাম সাথে করে।

: কে সমরেন্দ্র ?—প্রশ্ন করল স্বরাজ।

: সমরেন্দ্র আমাদের স্কুলের গেম্-ক্যাপ্টেন। যেমন খেলায়, তেমনি ডন-কুস্তিতে। একেবারে চ্যাম্পিয়ন ছেলে। কত কাপ পেয়েছে, মেডেল পেয়েছে—

কি যেন হঠাৎ মনে পড়তে সেবাব্রত বলে উঠল : আচ্ছা রনু, রথীদাকে সংবাদ দিয়ে আনলে হয় না? সেও তো অনেক কাপ, মেডেল পেয়েছে।

: কে রথীদা ?—প্রশ্ন করল রণধীর।

: ও হরি, তুমি তো তাকে দেখোই নি, তখন যে তুমি কলকাতায়। রথীদা আমার মাসতুত ভাই। এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে হাসারা গাঁয় তার বাড়ী। এই তো সেদিনও এসেছিল আমাদের বাড়ী। সেই তো আমাদের 'জয়রথ'কে নতুন করে জাগিয়ে দিয়ে গেল ; সভা করল ; শোভাযাত্রা করল। তাইতো আমরা সব শিখলাম। নইলে তুমি কলকাতা যাবার পর থেকে তো 'জয়রথ' অচল হয়েই পড়েছিল। কেমন কিনা স্বরাজ ?

স্বরাজ বলল : তা ঠিক। সারথী হলুদবাড়ী না এলে এত সব তুমি দেখতে পেতে না এখানে। সত্যি, ছেলেটা খুব কাযের। আর চেহারাটাও ভাল। যেমন মাস্‌ল্, তেমনি গায়ের জোর।

রণধীর প্রশ্ন করল : বাড়ীর পাশে হাসারা গাঁয় তার বাড়ী, অথচ এতদিন তো কৈ তার নাম শুনি নি। কি যেন নাম বললে সেবা ?

: নাম সারথী রায়। মাদারীপুরে পড়ত, এতদিন সেখানেই থাকত কাকার কাছে। এবারে ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

: ও ! কোন্ কলেজে পড়ছে এখন ?

: কলেজে পড়া আর হল কই। বাবা মারা গেলেন খুব ছোটকালে। কাকাই এতদিন পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ করেছেন। তিনিও গেল জানুয়ারী মাসে হঠাৎ মারা গেলেন। অগত্যা মাসিমা ছেলেকে নিয়ে দেশে চলে এসেছেন। এখন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতেই বসে আছে আর কি।

রণধীর সহানুভূতির গলায় বলল : আহা, তাহলে তো ছেলেটির বড় কষ্ট। কিন্তু, সে কি আসবে আমাদের 'জয়রথে' ?

সাগ্রহে সেবাব্রত বলল : তা আসবে ছাড়া কি। বাড়ীতে তো বসেই আছে। তা ছাড়া, এ-সব দেশের কাযে রথীদার খুব উৎসাহ। সেদিন আমার কাছে কত কথা বলল। গরীবদুঃখীর দুর্দশা, মহাজনের শোষণ, জমিদারের অত্যাচার, পরাধীনতার যন্ত্রণা—কত কি।

রণধীর বলল : বেশ, তাহলে কাল সকালেই তুমি চলে যাও সেবা। তোমার রথীদাকে একেবারে সাথে করে নিয়ে আসবে। আপত্তি করলে বলবে, তোমার আর একটি ভাই তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

সেবাব্রত ঘাড় নাড়ল : আচ্ছা, আমি ভোরেই তবে যাব।

সারথী এল।

সত্যি সারথী। যে-কোন রথের রশ্মি বুঝি নির্ভয়ে এর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। বেশ উঁচু শান্ত চেহারা। শ্যামল রঙ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। ঠোঁটের বাঁকা রেখায় সব সময়েই হাসি যেন লুটিয়ে পড়ে। চোখের চাউনিতে একটা তন্দ্রাতুর স্বপ্ন। চমৎকার!

একদিনেই রণধীর সারথীর ভক্ত হয়ে পড়ল। আর হবেই বা না কেন? কত গুণ এই সতের বছরের ছেলেটির। লাঠির প্যাঁচ দিতে একেবারে সব্যসাচী। দু'হাতে দুখানি তিন-হাতি লাঠি ও যখন ঘুরায় বিদ্যুৎবেগে, তখন চারদিক হতে অবিরাম ঢিল ছুঁড়েও ওর গায়ে লাগানো যাবে না। সব ভেঙে চুরমার হবে ওর লাঠিতে লেগে।

আবার তীর-ধনুকের খেলাতেও তেমনি। শব্দভেদী বাণ, সপ্ততাল ভেদ, মৎস-চক্রভেদ—সব কঠিন কঠিন তীরের খেলা ওর কাছে জলের মত সোজা।

তাছাড়া কুস্তি, যুযুৎসু, ওয়েট-লিফ্‌টিং—এ-সবে তো কথাই নাই। মাদারীপুর স্কুলে পড়তে পড়তেই ও একবার গিয়েছিল কলকাতায় ইণ্টার-স্কুল প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। সেবারে কত মেডেল আর কাপ যে ও পেয়েছে। সব সারথী 'জয়রথ'কে দান করবে। ওর দেশের বাড়ীতে থেকে সেগুলো তো নষ্ট হয়েই যাবে। তারচেয়ে সেগুলো রণধীরের কাছেই থাক।

সারথীকে পেয়ে 'জয়রথ' বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। হলুদবাড়ীর

বয়স্করাও ছেলেটির আলাপ-ব্যবহারে কাযে-কর্মে ভারী সন্তুষ্ট। সুবল সাধুর তো সে চোখের মণি। রথীভাই বলতে সে অজ্ঞান। সারথীও তাকে ভালবাসে ঠিক বড় ভায়ের মত। সকাল-সন্ধ্যা আখড়ায় ছেলেদের লাঠি খেলা, শড়কিচালা, কুস্তি ইত্যাদি শেখায়। বিকালে প্রায়ই শোভাযাত্রা করে, সভা জমায়। আর বাকী সময় সুবল সাধুর সাথে সাথেই কাটায়। রাতে কোনদিন বাড়ী যায়। যেদিন হলুদবাড়ী থাকে, সেদিন সুবল সাধুর ঘরেই ঘুমায়। সেখানেই খায়।

এ-নিয়ে রণধীর একদিন আপত্তি করল; সুবল সাধুর ওখানে কেন তুমি কষ্ট করে রাত কাটাও রথীদা, তুমি আমাদের এখানেই খাবে, এখানেই থাকবে।

সারথী উত্তরে বলল: ওটি আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। তোমরা বড়লোক। আমি গরীব। তোমাদের বাড়ী আমি থাকতে পারব না।

রণধীর দুঃখিত হল, বলল: কিন্তু রথীদা বড়লোক কি মানুষ না? তাদের কি প্রাণ নাই? তারা কি ভালবাসতে পারে না?

সারথী বলল: বড়লোক মানুষও বটে, ভালবাসতেও পারে বটে, কিন্তু গরীবের সম্মান দিতে তারা জানে না, দিতে পারে না।

এ কথার জবাব রণধীর দিল না। শুধু তার ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে কেঁপে উঠল।

সারথী বলল: তুমি দুঃখিত হয়ো না রণধীর। তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে একথা আমি বলিনি। যা আমি সত্য বলে মনে করি,

তাই বললাম। আমার মাষ্টার মশায় বলেন : নিরংকুশ সত্যকে শিরোধার্য করাই তো মনুষ্যত্ব।

রণধীর কথা বলল : এই যখন তোমার একান্ত বিশ্বাস, তখন আর তোমাকে বলব না আমাদের বড়ীতে থাকতে। তুমি সুবল সাধুর কাছেই থেকো।

কয়েকদিন পরে।

বেলা গোটা তিনেক। 'জয়রথে-'র একটা সভা আছে বিকেলে। তারি আলোচনার জন্যে সারথী আর রণধীর এসেছে 'জয়রথ' কার্যালয়ে।

আলোচনার ফাঁকে সারথী এক সময় জিজ্ঞাসা করল : আচ্ছা রণধীর, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব, ঠিক উত্তর দেবে তো ?

: বল।

: প্রায়ই আমি লক্ষ্য করি, সব সময়ই তুমি যেন অন্যমনস্ক থাকো। অনেক সময় দেখি, নানা কাযের মাঝেও তোমার কপালে যেন কোন্ গভীর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। ব্যাপার কি বলতো ? কিসের এত দুঃখ তোমার ?

: তোমার দরদী চোখে যখন আমার মনের ছবি আঁকা পড়েছে, তখন আর তোমাকে লুকাবো না রথীদা। সত্যি, সেদিনকার সভার পর থেকে আমি মনে মনে বড়ই কষ্ট ভোগ করছি। দশজনের মধ্যে সাইলক দি য়্যু বলে যে আমার দাদুকে অপমান করেছে, সে যে 'জয়রথে'-র একজন শুভকামী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'জয়রথে'-র প্রতি অন্তরের টান না থাকলে, বনমালী সরকারকে অপমান করবার

দুঃসাহস তার আসবে কোত্থেকে? অথচ আমাদের মধ্যে কে যে আমার দাদুর প্রতি অশিষ্ট আচরণ করতে পারে, তা তো আমার ধারণার বাইরে।

সারথী সহজভাবে প্রশ্ন করল: তার সন্ধান পেলে তুমি কি করবে রণধীর?

রণধীর উত্তেজিত হয়ে উঠল: কি করব? তাকে 'জয়রথ' থেকে তাড়িয়ে দেব, তাকে দল ছাড়া করব, তাকে একঘরে করব। আমরা কেউ তার সংগে মিশব না।

সারথী ধীরভাবে বলল: আচ্ছা, ধরো যদি তোমার দাদু না হয়ে আমার দাদুকে কেউ এ-কথা বলত, তাহলেও কি তাকে তোমরা একঘরে করতে?

: নিশ্চয়।

· কেন? তার অপরাধ?

: অপরাধ? তুমি কি বলছ রথীদা? একজন সম্মানিত ব্যক্তি, দেশের মাথা, তাঁকে অপমান করা অপরাধ নয়?

: আর সেই সম্মানিত ব্যক্তি যদি দশজনের অর্থে প্রচুর অর্থবান হয়েও দেশের হিতসাধনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কাযে সামান্য কিছু টাকা দান করতে নারাজ হন, তবে সেটা তাঁর অপরাধ নয়?

: নিশ্চয় অপরাধ।

: তবে তাঁর শাস্তির কি ব্যবস্থা তুমি করেছ বা করতে পার?

: তুমি কি বলছ রথীদা?

: তবে স্পষ্ট করেই বলি। যথেষ্ট সম্পত্তির মালিক হয়েও

সেদিন যে তোমার দাদু 'জয়রথে'র কাযের জন্য মাত্র পঞ্চাশটি টাকা দিতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না, সেটা কি দেশের নিকট তাঁর অপরাধ নয়? সে-অপরাধের কি শাস্তি হবে না?

রণধীর বিচলিত হয়ে পড়ল . কিন্তু আমার দাদু—

: তোমার দাদু বলেই তো বিচারের ব্যবস্থা ওল্‌টাতে পারে না। সত্যের রঙ বদলায় না। সে চিরশুভ্র।

রণধীর চুপ করল। কি জবাব সে দেবে। তবে কি সারথী যা বলেছে তাই ঠিক? তার দাদু দেশের কাছে অপরাধী? তাঁরো শাস্তি হবে?

দুজনেই চুপ। খানিক পরে কথা বলল সারথী: রণধীর, সেদিন অন্ধকারে আমিই তোমার দাদুকে বলেছিলাম সাইলক দি য্যু।

আকাশ থেকে পড়ল রণধীর : তুমি?

: হ্যাঁ, আমি। তোমাদের সভার সংবাদ পেয়ে সন্ধ্যার পরেই বাড়ী থেকে রওনা হলাম। কালী-মণ্ডপে পৌঁছে শুনি তুমুল বাদ-বিতর্ক। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। হঠাৎ এক সময় নিজের অজ্ঞাতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অশিষ্ট ভাষণ।

: বলো কি রথীদা, তুমি করলে আমার দাদুর অপমান?

: বলেছি তো অন্যায় কিছু আমি করিনি, অন্তত আমার মতে। তিনি যা তাই বলেছি। তবে ভাষাটা একটু অসংযত হয়েছিল, সে-দোষ আমি স্বীকার করছি।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল রণধীর : সত্য কথাই যদি বলেছিলে, তবে গা-ঢাকা দিলে কেন?

: কেন? সম্ভবত নিজের দুর্বলতার জন্য। অন্যায়কে অন্যায়

বলবার শক্তি আমারো খুব বেশী ছিল না বলে। সত্যি বলছি, তোমার দাদুর সেই ক্রুদ্ধ হুংকারে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। তাঁর সামনে তখন মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস আমার বুঝি ছিল না।

সারথী চুপ করল। রণধীরও চুপ। সারথী উঠে দাঁড়াল। বলল : চলো।

রণধীর সবিস্ময়ে বলল : কোথায় ?

: তোমার দাদুর কাছে।

ভীতকণ্ঠে রণধীর শুধাল : কেন ?

: সেদিনের সব কথা খুলে বলতে।

: সে কি ?

সারথী দৃঢ় গলায় বলল : হ্যাঁ। সেদিন যে শক্তির অভাব ছিল, আজ তা ফিরে পেয়েছি। অন্তত পেয়েছি কিনা তা পরীক্ষা করব।

রণধীর তবু উঠল না। হাতের পেন্সিলটা নাড়তে নাড়তে বলল : কিন্তু আমি বলছি, এ-সব থাক। দাদুর কাছে যেয়ে কায নেই।

: আছে। এক তো আমার নিজেরি প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, তোমার দাদুর অপমানের প্রতিকার করবার যে দায়িত্ব তুমি নিয়েছ, তার খোঁচায় তোমার মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। সে কাঁটা আমি নিজ হাতে উপড়ে ফেলবই।

অভিযোগের সুরে বলল রণধীর : তাহলে আমার জন্যেই তুমি এই বিপদ বরণ করছ রথীদা ?

: বিপদ ?

: নিশ্চয় বিপদ। তুমি কি মনে করেছ তোমাকে হাতে পেয়ে তিনি এমনি ছেড়ে দেবেন? দাদু এমনি খুব ভাল মানুষ, কিন্তু রাগলে তিনি ভয়ংকর।

সহজ হাসির সংগে সারথী বলল: সেই ভয়ংকরের সংগেই আমার ভালবাসা। চলো।

রণধীরের হাত ধরে সারথী সরকার বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

দুপুরের ঘুমের পর সরকার মশায় খবরের কাগজ পড়ছেন। আলবোলার নলটা পাশেই পড়ে আছে। আকাশে মেঘ করেছে।

ঘরে ঢুকল রণধীর। পিছনে সারথী।

বাঁ হাতে চশমাটা একটু তুলে সরকার মশায় শুধালেন: কে?

রণধীর বলল: আমরা।

: কে রণু? আয়। তোর সংগে কে?

: রথীদা তোমার সংগে দেখা করতে এসেছে দাদু।

চশমাটা ঠিক করে নিতে নিতে সরকার মশায়, বললেন: ও, তুমিই সারথী। অনেকের মুখেই শুনেছি তোমার কথা। সুবল সাধু তো তোমার নামে অজ্ঞান।

সারথী সবিনয়ে বলল: তিনি আমাকে ছোট ভায়ের মত স্নেহ করেন।

: স্নেহ করেন, তা বেশ। কিন্তু তুমি অমন দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবুজী? গরীবের বাড়ী যখন এসেইছ, তখন একটু বসাই হোক। রণু, চেয়ারটা—

: না, চেয়ার কেন। আমি এখানেই বসছি।

সারথী খাটের একপাশেই বসে পড়ল। রণধীরও বসল। সরকার মশায় খবরের কাগজ ওল্টালেন।

একটু পরে সারথী বলল: দেখুন, একটা কথা বলতে আমি এসেছি।

সরকার মশায় চোখ তুললেন: ওঃ। তা বেশ। বলো।

: সেদিন কালী মণ্ডপের সভায় আমার মুখ দিয়েই কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল—

ছেলেটির অসীম দুঃসাহসে সরকার মশায় বিস্মিত হলেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন: সেই কথাটা আর একবার শোনাতেই কি তোমার এখানে আসা হয়েছে?

: দেখুন, কথাটা ওভাবে বলবার ইচ্ছা আমার ছিল না। ভাষার অসংযমের জন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করছি।

সরকার মশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন: ছাখ, একটা প্রবাদ বাক্য আছে, কাক কাকের মাংস খায় না। তোমার কি বিশ্বাস, ধনী লোকগুলো গরীবের বুকের মাংস খায়?

: আজ্ঞে বলেছি তো, কথাটা ওভাবে বলবার ইচ্ছা আমার ছিল না। ভাষার অশিষ্টতার জন্য আমি দোষ স্বীকার করছি, আর সেই জন্যেই এখানে এসেছি।

: তাহলে ভাষার ব্যঞ্জনাটুকু বাদ দিয়ে আসল কথাটা ঠিকই। ধনীরা গরীবের অর্থ লুটেই আমোদ-ফুর্তি করে—কেমন?

: আজ্ঞে, শুনতে অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্য বইকি।

উত্তরে সরকার মশায় কি বলতে যাচ্ছিলেন। মাঝ পথে থেমে

গেলেন। বললেন : যাক্‌গে এসব তর্ক। তোমরা যা বোঝ আমরা তা বুঝি না, আর আমরা যা বুঝি তোমরা তা বোঝ না। সুতরাং এ-তর্ক থাক। কিন্তু তুমি যে-জন্য এসেছ, তারো কোন প্রয়োজন ছিল না।

সারথী স্পষ্ট গলায় বলল : আমারো আসবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম, আমার জন্যে একটা প্রতিষ্ঠানের উপর আপনার বিষ-নজর পড়বে, অনেকগুলো ছেলের অনেক আশার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হবে, সে বড় অন্যায়। তাই এসেছি আমার প্রাপ্য শাস্তি নিতে।

সরকার মশায় হেসে উঠলেন, বললেন : ভুল করেছ বাবুজী, এখানেও ভুল করেছ। বনমালী সরকার শেয়াল নয়, সিংহ। শিকার ধরবার জন্যে সে একবারই লাফ দেয়, তার বেশী না। যদি শিকার জোটে, মুখ ভরে শুধু রক্ত খায়, নইলে অনাহারেই দিন কাটায়। সেদিন সভায় আমার দাদাভাইয়ের হাত ধরে যাদের ক্ষমা করে এসেছি, তাদের উপর দ্বিতীয় আঘাত আমি কোনদিনই করব না।

'ক্ষমা' কথাটায় সারথীর শরীর ঘৃণায় শিউরে উঠল। দৃপ্তকণ্ঠে ও বলল : আজ্ঞে ক্ষমা আমি চাই না, আমি চাই শাস্তি—যে-শাস্তি আপনি ন্যায্য মনে করেন।

সরকার মশায় হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। সারথীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : পারবে শাস্তি নিতে?

রণধীরের বুক থর থর করে কেঁপে উঠল। সারথী অকম্পিতকণ্ঠে বলল : পারব।

: ঠিক ?

: সন্দেহ থাকলে স্বেচ্ছায় আপনার কাছে আসতাম না। দিন শাস্তি।

: দাদাভাই সেদিন আমাকে বলেছে, বড়লোক বলে তুমি আমাদের বাড়ী খাওনা, থাকো না। আমি শাস্তি দিচ্ছি, এই বড় লোকের বাড়ীতে তোমাকে থাকতে হবে, খেতে হবে, যতদিন না আমি নিজে তোমায় মুক্তি দেব।

সারথী বাধা দিল : কিন্তু—

সরকার মশায় হেসে উঠলেন : আপত্তি তো চলবে না বাবুজী। পাঠার ইচ্ছায় তো ঘাড়ে কোপ নয়। আমি শাস্তি দেব, তুমি নেবে। তোমার ইচ্ছা মত তো শাস্তি হবে না। বলো রাজী ?

সারথী এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর সরকার মশায়কে প্রণাম করে বলল : আপনার ইচ্ছাই শিরোধার্য। এই শাস্তিই আমি মাথা পেতে নিলাম, যদিও এরচেয়ে বড় শাস্তির কথা আমি ভাবতেও পারি না।

সস্নেহে সারথীকে তুলে ধরে সরকার মশায় বললেন : তাহলে আরো একটু শাস্তি তোমাকে পেতে হবে ভাই। রণু আমাকে দাদু বলে ডাকে, তুমিও তাই বলবে। রণু, তোমার দাদাকে প্রণাম করো।

রণধীর হাতে স্বর্গ পেয়েছে। আগে দাদুকে প্রণাম করে সারথীকে প্রণাম করল। সারথী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

আকাশ ভেঙে তখন জল নেমেছে বাইরে।

চাঁদের আলোয়

শুক্লা চতুর্দশীর সাদা রাত। নির্মল নির্মেঘ আকাশ। মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদ রূপার থালার মত ঝক্ ঝক্ করছে।

সুবল সাধুর গানের নিমন্ত্রণ—কালী মণ্ডপ সরগরম। হলুদবাড়ীর ছেলেবুড়ো অনেকেই হাজির। 'জয়রথে'র রথীরা এসেছে দল বেঁধে। তাদের উপলক্ষ্য করেই তো গান। অনুপস্থিত শুধু সারথী। দুদিন হলো সে বাড়ী গেছে। মায়ের শরীর ভাল নয়।

গান বেশ জমে উঠেছে। আজ সুবল সাধু চমৎকার সেজেছে। ঢোলা গেরুয়া আলখাল্লা গলা থেকে একেবারে হাঁটুর নীচে অবধি নেমেছে। নাকে চন্দনের রসকলি, কপালে ফোঁটা। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা। তাতে ফুল গোঁজা। ছেলেরা টগর ফুলে গাঁথা সাদা মালাটা গলায় দুলিয়ে দিয়েছে। একতারার তান তুলে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে সুবল সাধু মধুর কণ্ঠে গাইছে নিজের বাঁধা গান ঃ

বাঙলা দেশের ছেলে।
(আমার) মাথার মাণিক এরাই তো ভাই
চাইনা স্বরগ এদের ফেলে।
সোনার হাতে বাঁশের লাঠি,
বাঙলা দেশের মানুষ খাঁটি,
রাখবে এরাই দেশের মাটি
সকল বিপদ ঠেলে।
বাঙলা দেশের ছেলে।

এরাই আমার ব্রজের রাখাল,
সামাল সামাল কংস।
(এরা) নতুন যুগের নতুন মানুষ
রুদ্র শিবের বংশ।
এদেরি গান গাইব রে ভাই,
একতারাটি বেঁধেছি তাই,
(ওরে) সুবল সাধু চায় না কিছু
গৌর কিশোর পেলে।
বাঙলা দেশের ছেলে।

নানা ভাবে নানা ভংগীতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুবল সাধু গানটি গাইল। যেমন গলার স্বর, তেমনি একতারার বোল, আর তেমনি নূপুরের তাল। গানের সুর যেন মন্ত্রের মত সকলের মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ।

গান থামল। সুবল সাধু একতারা ঠেকাল কপালে। সরকার মশায় তারিফ করে বললেন: এ-গান তোমার লাখ গানের এক গান সাধু। খাসা গেয়েছ তুমি আজ।

পায়ের নূপুর খুলতে খুলতে সুবল সাধু বলল: আমি কি আর গেয়েছি কর্তামশায়, যাদের গান তারাই গাইয়েছেন। এ যে ব্রজবালকদের নাম-কীর্তন, নিজের পালে এ গানের তরী নিজেই ভেসে চলে। ভাবের বাতাস মন থেকে আপনি বইতে সুরু করে।

নিতাই পাল টিপ্পনি কাটল: সাধু যে আজ ভাবে একেবারে ডগমগ, বলি ব্যাপার কি? কল্কের গোড়ায় কিছু পড়ছে নাকি ওদিক থেকে।

সুবল সাধু জবাব দিল : ভাব থাকলেই মাঝে মাঝে ডগমগ হতে হয় বই কি পাল মশায় ? মনটাকে তো আর বিষয়-শশ্মানে পুড়িয়ে কয়লা করি নি এখনো।

উচিত জবাবে সবাই হেসে উঠল। সরকার মশায় বললেন : ওর সংগে লাগতে যেও না নিতাই, পেরে উঠবে না। সাধুর তরীতে আজকাল সারথীর ভর হয়েছে। ও এখন জলে-স্থলে সমান চলে।

সারথীর কথায় সুবল সাধুর মুখ কালো হয়ে উঠল : সত্যি কর্তামশায়, আজকের গান আমি রথী ভাইকে শুনাতে পারলাম না, এ-দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।

গান ছেড়ে সবার মুখেই সারথীর আলোচনা সুরু হল। ধীরে ধীরে গানের আসর ভেঙে গেল। সবাই যে-যার ঘরের পথে পা দিল।

ছেলেরা কিন্তু ঘরে গেল না। তারা দল বেঁধে গেল মাঠের দিকে। চাঁদের আলোয় ধোঁয়া রাতের আকাশ ডাক দিয়েছে ওদের স্বপ্নাতুর মনকে। ছিঁড়ে গেছে ঘরের বাঁধন। টুটে গেছে আরামের নেশা। বিরাট বিশ্বের সীমাহীন পথে কিশোর মনের যাত্রা নিরংকুশ।

গ্রামের বাইরে রেলের রাস্তা। রেল লাইন ধরেই ওরা এগিয়ে চলল। লাইন ক্রমে তীক্ষ্ণতর হতে হতে চলে গেছে দূরে—দূরান্তরে। ওদেরো চোখে লেগেছে দূরের নেশা। কেউ চলেছে কাঠের স্লিপার ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে। কেউ-কেউ দুজনে মিলে হাত ধরে ধরে চলেছে লাইনের উপর দিয়ে হেঁটে।

হঠাৎ স্বরাজ চেঁচিয়ে বলে উঠল : বাঃ বাঃ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওই চীনে-মাটির টুপীগুলো।

সবাই ফিরে তাকাল। সত্যি। টেলিগ্রামের থামের মাথায় বসানো চিনে-মাটির টুপিগুলোর উপর চাঁদের আলো পড়ে চক চক করছে। যেন অনেক দামী পাথর-বসানো মুকুট পরে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এই সব-পেয়েছি-দেশের রাজারা।

সেবাব্রতর কি খেয়াল হল, লাইন থেকে একটা ছোট পাথর নিয়ে ছুঁড়ে মারল থামের মাথা লক্ষ্য করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, কিন্তু পাথর লেগে টেলিগ্রামের তারগুলো ঝন্-ঝন্ করে বেজে উঠল।

সে-শব্দে দোলা লাগল ছেলেদের বুকের রক্তে। জেগে উঠল কিশোর মনের খেয়ালী দেবতা। অকারণ পুলকে ওরা মেতে উঠল নতুন খেয়ালে। একের পর এক সবাই পাথর ছুঁড়তে লাগল টুপি-গুলো লক্ষ্য করে। দেখি কে কয়টা ভাঙতে পারে। কার হাতের নিশানা ঠিক।

ঠুং-ঠাং, ঝন্-ঝন, ঝর্-র্-র্, ছর্-র্-র্ শব্দে মুখর হয়ে উঠল প্রশান্ত রাত্রি। সে-শব্দের ঝংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠল ছেলেদের খেয়াল। চীনে-মাটীর টুপি ভাঙ্তে ভাঙ্তে ওরা এগিয়ে চলল লাইন বেয়ে।

সহসা ওদের কানে এল, পিছনে কারা যেন চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে। সবাই কান পাতল। স্পষ্ট শোনা গেল কারা যেন বলছে : পাকড়ো— পাকড়ো-গুণ্ডালোক্‌কো পাকড়ো—

ছেলেদের বুক কেঁপে উঠল। সর্বনাশ। নিশ্চয় রোড-ক্রসিং-য়ের গিম্‌টি-ঘরের দারোয়ান ব্যাটা টের পেয়ে লোকজন নিয়ে আসছে। এখন উপায় ?

রণধীর বলল : সত্যি, ঝোঁকের মাথায় গুরুতর অন্যায় কায ক'রে বসেছি আমরা। অন্য সময় হলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু এখন দেশের যে অবস্থা। সর্বত্র টেলিগ্রামের তার কাটছে, রেল লাইন তুলে ফেলছে, ষ্টেশন-ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। এ-অবস্থায় আমরা যা করেছি, তাতে তো ভারত রক্ষা আইনে হাত-কড়া পড়বে প্রত্যেকের হাতে। আর শুধু আমাদেরি নয়, আরো অনেকের,—যারা নিরপরাধ—

রেলের কুলী ও পাহারাওলাদের চেঁচামেচি নিকটতর হল। ওই বুঝি দেখা যায় তাদের মূর্তি বাঁকটার মাথায়। ফিস্ ফিস্ করে রণধীর বলল : আর একমুহূর্ত দেরী নয়। যে যার মত পালাও। কিন্তু সাবধান ভাই সব, কেউ যেন ওদের হাতে ধরা দিও না—কোন মতেই নয়। আজ তো গা বাঁচাই, তারপর দেখা যাবে।

ছুট—ছুট—ছুট। বন-বাদাড়, খেত-খামার, মাঠ-প্রান্তর পার হয়ে রুদ্ধশ্বাসে ওরা ছুটে চলল গ্রামের দিকে।

পাহারাওয়ালারা চেঁচিয়ে উঠল : ভাগ যাতা হ্যায়—শালা গুণ্ডা-লোক ভাগ যাতা হ্যায়—পাকড়ো—পাকড়ো—

তারাও ছুটল পাছে পাছে। ছেলেরা ছুটছে অনেক আগে। তবু ওদের চোখ এড়াতে পারে না। খোলা মাঠের মাঝে চাঁদের আলোয় সব সুস্পষ্ট। হায় রে! এর চেয়ে যে ভাল ছিল কৃষ্ণপক্ষ, ভাল ছিল মেঘে-ঢাকা অমাবস্যা রাত।

———

ভূতের মুখোস

পরদিন বেলা ন'টা। 'জয়রথে'-র মজলিস মুখর হয়ে উঠেছে গত রাতের অভিযানের আলোচনায়। সকলেই নিজ নিজ কৃতিত্বের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করতে ব্যস্ত।

স্বরাজ বলল হাত ঘুরিয়ে : আমি তো ভাই ছুটছি নাক-কান বুঁজে। পিছু নিল এক ব্যাটা ষণ্ডামার্কা কুলী। ব্যাটা যেন খরগোসের পুষ্যিপুত্তুর। ধরে ফেলে আর কি প্রায়। সামনেই একটা বাঁশ ঝাড়ের ওপার দিয়ে পথটা গেছে ডাইনে বেঁকে। তারপরেই শটীগাছের একটা ঝোপ। চট্ করে মাথায় খেলে গেল একটা বুদ্ধি। পিছনে চেয়ে দেখি, বাঁশ ঝোপের ওপারে কুলীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর কথা কি। ঝাঁ করে সটান শুয়ে পড়লাম শটীর ঝোপের ভিতর। একটু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে কুলিটা এসে হাজির। শটীর ঝোপের পাশে এসেই থামল। কোন্‌দিকে আর যাবে। শিকার যে অদৃশ্য হয়েছে। আমারও বুকে ঢিপ ঢিপ করছে। এখন যদি টের পায়, আমি শ্রীমান তার পাশেই শটী-শয্যায় শয়ান, তবেই দফা অক্কা। কিন্তু আসলে সবই হল ফক্কা। ব্যাটা হতাশ হয়ে বলল : নাঃ, ই শালা লোক ভেল্‌কী দেখায়কে ভাগ গিয়া। তারপর স্বস্থানে তার প্রস্থান আর শ্রীমান স্বরাজের স্বগৃহে গমন ও সুনিদ্রা।

সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। এমন সময় ত্রস্তপদে ঘরে ঢুকল সমীর, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার মশায়ের ছেলে। বছর এগার

বয়েস। ভীতকণ্ঠে ও বলল ঘরে ঢুকেই : সর্বনাশ হয়েছে রণুদা, থানার দারোগা এসেছে আমাদের এ্যারেস্ট করতে।

উপস্থিত সবারি মুখ চুণ : এ্যাঁ, বলিস কি ? কোথায় ?

সমীর তখনো হাঁপাচ্ছিল। বলল : হেডমাষ্টার মশায়ের বাসায়। আমি এক্ষুণি দেখে এলাম।

রথীবৃন্দের অবস্থা সংগিন। অবসিদন্তি গাত্রানি অবস্থা। হেড-মাষ্টার মশায়ের ছেলে নীলাম্বর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল : আমি তাহলে বাড়ী যাই রণুদা। দারোগা হয়তো এখানেই এসে পড়বে—

রণধীরের কপালে চিন্তার কুটীল রেখা। চোখে ভয়। ঠোঁটে দৃঢ়তা। সারা মুখে নানা বিরুদ্ধ ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত। গম্ভীর গলায় ও বলল : ভুলে যেও না তুমি 'জয়রথে'-র রথী। ভাবী সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক। এত সহজে বিচলিত হওয়া তোমার পাপ।

তারপর সমীরকে জিজ্ঞাসা করল : দারোগা যে আমাদের এ্যারেস্ট করতেই এসেছে, তা কি করে জানলি তুই ? হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে তাঁর অন্য কায-ও তো থাকতে পারে।

সমীর জবাব দিল : বারে, আমি যে বেড়ার ফাঁকে আড়ি পেতে শুনে এলাম সব কথা। গিম্‌টি-ঘরের সেই বুড়ো দারোয়ানটা যেয়ে থানায় নালিশ করেছে,—ইস্কুলের ছাত্রবাবুরা লাঠি-সড়কী নিয়ে রাত্রে টেলিগ্রামের তার কাটতে গিয়েছিল। কিছু কিছু কেটেছে-ও। কিন্তু তারা সময়মত তাড়া দেওয়ায় সব পালিয়ে যায়। তাই তো দারোগা এসেছে। চোখ গরম। মুখ লাল। হেডমাষ্টার মশায়ের উপর সে কি তম্বী। যেন লাট সাহেবের নাতি।

সমীর উত্তেজিত হয়ে উঠল বলতে বলতে। রণধীরের চোখ দুটো

মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে তখনি নিভে গেল। শুধাল : তারপর ? কি বলল দারোগা ?

: সব কথাতো আমি শুনতে পাই নি। প্রথমেই হুংকার দিয়ে উঠল : সব এ্যারেস্ট করে নিয়ে আমি গারদে পুরব। এ সস্তা ইয়ার্কির মজা বুঝিয়ে দেব।

হেড মাষ্টার মশায় শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন : আমার স্কুলের ছেলেরাই যে এ কায করেছে, তার কোন প্রমাণ কি আপনি পেয়েছেন ?

দারোগা ঈষৎ হেসে বলল : প্রমাণ না পেয়ে কি আমরা কোন কায করি মষ্টারমশায়। গিমটি-ঘরের দারোয়ান শম্ভু মিছির আর ষ্টেশনের পাহারাওয়ালারাই দেবে প্রমাণ।

হেড মাষ্টারমশাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে দারোগার সংগে কি যেন আলাপ করতে লাগলেন। আমি তার কিছুই শুনতে পেলাম না। তাই একদৌড়ে ছুটে এলাম তোমাদের সংবাদ দিতে। কি হবে রণুদা ?

রণধীর কি তা জানে। তবু ছেলেদের উৎসাহ দিয়ে বলল : কোন ভয় নাই তোমাদের। আমরাই যে এ সব হৈ-চৈ করেছি, তা প্রমাণ করা এত সোজা নয়। গ্রামের সবাইকে দিয়ে আমরাও সাক্ষী দেওয়াব যে, কাল রাত একটা পর্যন্ত কালী-মণ্ডপে সুবল সাধুর গান শুনেছি আমরা সবাই। তখন বোঝা যাবে দারোগাবাবুর জারিজুরি।

এ-যুক্তিতে সবাই খানিকটা আশ্বস্ত হল। তবু প্রকৃত আসামীদের বুকের টক-টকানি গেল না। কি জানি, যদি আসল ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায় !

রণধীর বলল : এইবার তুমি চটকরে বাড়ী চলে যাও নীলু। পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকে লুকিয়ে আড়ি পেতে সব কথা শুনবে। বিকেলে তোমার কাছে এর রিপোর্ট চাই। অবিশ্যি, হেড মাষ্টার মশায় যখন এর মধ্যে পড়েছেন, তখন সহজে আমাদের কোন বিপদ হবে না। তবু সাবধানের মার নাই।

নীলাম্বর সংকোচের সংগে জিজ্ঞাসা করল : আমি তা হলে বাড়ী যাব রণুদা ?

রণধীর হেসে বলল : হ্যাঁ, যাও।

নীলাম্বর চলে গেল। রণধীর আবার কথা বলল : আমাদেরও আর এ-ভাবে জটলা পাকিয়ে বসে থাকা ভাল নয়। কি জানি, দারোগাবাবু যদি এখানে একবার পদধূলিই দেন। সবাই যার যার বাড়ী চলে যাও। ওবেলায় সব জেনে শুনে তখন যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

ছেলেরা চলে গেল। রণধীর বসেই রইল। ওর মাথায় অনেক চিন্তার ঢেউ। শেষ পর্যন্ত কোথায় যে ব্যাপারটা দাঁড়াবে, কে জানে। যা দিনকাল এখন। ওদের মনে অবশ্যি কোন দুরভি-সন্ধি-ই ছিল না। কিন্তু অন্যে তা শুনবে কেন ? দারোগা তা মানবে কেন ? সে-ও তো পরের চাকরী করে। তারো তো একটা দায়িত্ব আছে।

: এত গভীর চিন্তা কিসের রণুভাই ? রথচক্র কি গ্রাসিল মেদিনী ?

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল সারথী। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে। বাড়ী থেকে হেটে এসেছে দুপুর রোদে।

সোল্লাসে রণধীর বলে উঠল : উঃ, কি ভাল সময়েই যে তুমি এসে পড়েছ। এদিকে যে মহামারী কাণ্ড। কি যে হবে।

টিনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে সারথী বলল : রথীবৃন্দ সব গেল কোথায় এরি মধ্যে ?

: এতক্ষণ এখানেই ছিল। এইমাত্র গেল সব। আমিই পাঠিয়ে দিলাম যার যার বাড়ী।

: কেন ?

: তুমি তো সব জান না রথীদা। তবে শোন ব্যাপারটা।

সারথী হেসে বলল : ব্যাপার আমি সব জানি। ওদের সব পাঠিয়ে দিলে কেন তাই বল। ওদের দিয়ে যে আমার দরকার।

রণধীর বিজ্ঞের মত বলল : পাছে দারোগা 'জয়রথে' হাজির হয়ে আমাদের সকলকে এক জায়গায় দেখে কোনরকম সন্দেহ করে, তাই সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি।

সারথী সশব্দে হেসে উঠল : এই তো চাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রথ তুমি চালাতে পারবে। এটা তুমি খুব বুদ্ধিমানের কায করেছ।

হঠাৎ ঘরের ও-কোণে চোখ পড়তেই সারথী বলে উঠল : এঃ, একটা বড় ভুল করে ফেলেছ রণু।

রণধীর চমকে শুধাল : কি রথীদা ?

: আরে বিপক্ষের চোখে ধূলো দিতে সৈন্যদের সব 'ক্যামোফ্লাজ' করলে, অথচ তাদের সৈনিকত্বের পরিচয় অস্ত্রশস্ত্রগুলো রেখে দিলে চোখের সাম্‌নে ? ছেলেদের সব পাঠিয়ে দিলে, আর লাঠি শড়কি-গুলো ভুলে গেলে ?

: ইস্—তাইতো। জিভেয় কামড় দিয়ে রণধীর উঠে দাঁড়াল।

: কোথায় চল্‌লে ?

: এগুলো সরিয়ে ফেলি তাড়াতাড়ি।

: তার আর দরকার হবে না। দারোগাবাবুর সাইক্‌ল্‌ এতক্ষণ হলুদবাড়ীর সীমা পার হয়ে গেছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রণধীর : বলো কি রথীদা ?

: হ্যাঁ। আরো যা বলি তাও শোন। হেডমাষ্টার মশায় আমাদের হয়ে যথেষ্ট প্লিড্‌ করার ফলে দারোগাবাবু্‌ এ-ব্যাপারের বিচারের ভার তাঁর হাতেই দিয়ে গেছেন।

রণধীর বাধা দিল : আমরাই যে এ-সব করেছি তার প্রমাণ হেড-মাষ্টার মশাই কোথায় পেলেন ?

: প্রমাণ তিনি পান নি। ব্যবস্থা হয়েছে, কাল সোমবারে গিমটি-র দারোয়ান শম্ভু মিছির স্কুলে গিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের আইডেন্টিফাই করবে, আর হেডমাষ্টার মশাই তাদের প্রত্যেককে স্কুলের পরে প্রকাশ্যভাবে বেত মারবেন।

: এ্যাঁ—বেত ? রণধীরের গলায় ক্রোধ ও আতংক।

শক্ত গলায় সারথী বলল : হ্যাঁ বেত, সকলের সামনে। আর যে-কোন ছেলেকে আইডেন্টিফাই করাই শম্ভু মিছিরের পক্ষে সম্ভব। সত্য-মিথ্যার ধার ও কি ধারে।

রণধীর যেন অতল জলে পড়েছে : কি হবে রথীদা ? এ তো কেবল বেত খাওয়ার প্রশ্ন নয়। 'জয়রথে'-র মর্যাদা, তার অস্তিত্ব পর্যন্ত এর সাথে জড়িয়ে আছে।

সারথীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ঃ সে মর্যাদা, সে অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

: কেমন করে ?

: অতি সহজে। তুমি জানো না রণু, প্রাণের মায়া সবাই করে। আর শম্ভূ মিছির তো দেহ-সর্বস্ব একটা জীবমাত্র।

রণধীর ভয় পেল : তুমি মারবে নাকি ওকে ?

: না, মারের ভয় দেখাব। আর তাতেই কায উদ্ধার হবে।

: তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না রথীদা, স্পষ্ট করে বল।

: শম্ভূ মিছিরকে ভয় দেখিয়ে বলতে হবে যাতে সে কোন ছেলেকেই আইডেন্টিফাই না করে। বাস্, তাহলেই হেডমাষ্টার মশায়ের বেত-ও বন্ধ হবে আর দারোগাবাবুর-ও মুখ চুন হবে। কেমন, এ-আইডিয়া তোমার কেমন লাগে ?

চিন্তিত গলায় রণধীর জবাব দিল : কিন্তু—ধরো যারা শম্ভূ মিছিরকে শাসাতে যাবে, তাদের নাম যদি ও বলে দেয় হেডমাষ্টার মশায়কে বা দারোগাকে, তাহলে ?

তাচ্ছিল্যের সংগে সারথী বলল : বলেছি তো, প্রাণের ভয় সবাই করে এবং শম্ভূও করবে। তাছাড়া, আমাদের কাউকেই যাতে ও চিনতে না পারে, তার জন্যেই তো সেবাব্রতকে খুঁজছি। তাকে আমার জরুরী দরকার।

: কেন ? কি করবে সেবা ?

রহস্যময় মৃদু হেসে সারথী বলল : সেবা ভাল ছবি আঁকতে পারে। তাড়াতাড়ি কতকগুলি মুখোস এঁকে দেবে পিজবোর্ডের উপরে।

: মুখোস ?

: হ্যাঁ, ভূতের মুখোস।

গভীর রাত। প্রায় বারোটা বাজে। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ এখনো মেঘে ঢাকা।

নিস্তব্ধ গ্রাম। পথ জনমানবহীন। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক কানে আসে। বড় বড় গাছের পাতায় বৃষ্টির জল পড়ছে টুপ্-টাপ্ করে।

গ্রামের বাইরের সরু পথটা ধরে এগিয়ে চলেছে পাঁচটি ছায়ামূর্তি—পঞ্চ কিশোর: সারথী, রণধীর, সেবাব্রত, স্বরাজ ও সমীর।

মাথার উপর চোখ তুলে সেবাব্রত বলল ফিস্ ফিস্ করে: আকাশটা মেঘে-মেঘে কালো হয়ে উঠল আবার।

যেতে যেতেই সারথী জবাব দিল: ঈশ্বর সুপ্রসন্ন। এই মরা জোছনায়ই তো ভূতের খেলা জমবে ভাল।

সামনে রেল লাইন। রাস্তার বাঁ'ধারে গিমটি-ঘর। একতলা ইঁটের খুপরী একটা। শম্ভু মিছিরের আস্তানা। ঘরের পিছনেই একটা ঝাঁক্ড়া আম গাছ। ছাদের উপর একেবারে ঝুঁকে পড়েছে। একপাশে ছোট লাউ-মাচা।

নিঃশব্দ পদচালনায় আমগাছ বেয়ে একে একে সবাই উঠল গিম্‌টি-ঘরের ছাদে।

ঘরের সামনে একটা কাঠের ছোট আসনে বসে আছে শম্ভু মিছির। সাড়ে এগারটার ট্রেণটা পাস্ করিয়ে এখন ওর বিশ্রাম। এক কল্‌কে গাঁজা সেজে নিয়ে মনের আনন্দে বসে টানছে।

হুঁম—

একটা বিকৃত অনুনাসিক আওয়াজ করে সারথী নিচু ছাদ হতে লাফিয়ে পড়ল উঠানে। মুখে কিম্ভূত-দর্শন ভূতের মুখোস।

শম্ভুর বুক উঠল ধড়াস্ করে। সাধের কলকে গেল ছিঁটকে পড়ে। রা-ম্-ম্-ম্ বলে সে চোখ বুঁজল। দাঁত-কপাটি লাগে বুঝি।

: ডরো মাত্ মিছিরজী, ময় ভূত নেহি হুঁ।

পরিষ্কার মনুষ্যকণ্ঠ শুনে শম্ভু অকূলে কূল পেল। পিট-পিট করে চোখ খুলে কাঁপা গলায় বলে উঠল : রাম—রাম—রাম—

: শোন মিছিরজী, কাল ত্বপহরমে ইস্কুলিয়া ছাত্রলোগনকা আইডেন্টিফাই করনেকো তুম্হারা বাত হ্যায় কি নেই ?

: হ্যায় হুজুর।

: কই ছাত্রলোগকো তুম আইডেন্টিফাই মাত্ করো।

: বাকী—উ লোকতো টেলিগ্রাফকা বহুত ক্ষতি কর দিয়া।

সারথী চটে উঠল : দিয়া তো তুম্হারা কিয়া ? টেলিগিরাফ তুমহারা বাপ্কা সম্পত্তি, শুয়ার ?

শম্ভুর প্রথম আতংকের রেশ এতক্ষণে কেটে গিয়েছে। একটিমাত্র মুখোসধারীর ধমকে ঘাবড়াবার মানুষ সে নয়। এগিয়ে এসে বলল : আরে, তোম্ কোন্ হ্যায় থোড়া দেখ্না চাহিতো—

সংগে সংগে হুংকার দিয়ে উঠল রণধীর ও স্বরাজ : খবরদার---জান লেগা—

ধুপ্ ধুপ্ করে লাফিয়ে পড়ল আরো চারটি ভূত। শম্ভু সভয়ে পিছিয়ে যেয়ে রাম রাম করে উঠল : মাপ্ কিজিয়ে বাবুজী, হাম গরীব আদমী—

সারথী বলল : কুস্ ডর নেহি। বাকী কাহা কি কই লোককো তুম্ আইডেন্টিফাই নেই করে গা।

আচ্ছা—আচ্ছা বাবুজী। ইস্কুলমে কাল হাম্ যায়েগাই নেহি।

: নেহি নেহি। ইস্কুল পর তুম্ জরুর যাও। মগর কই লোককো চিনা মাত্ করো। সমঝো?

: হাঁ, হাঁ, বহুত খুব সমঝা।

এবার কথা বলল রনধীর : আউর এক বাত শোন। ইস্ ঘটনাকো কথা কিসিসে না কহনা। কই কো কহনে সে তুম্হারা জান যায়েগা। খবরদার।

শম্ভূ ভয়ে ভয়ে বলল : ভগোয়ানকা কসম বাবুজী, ই বাত হম কিসিসে নেহি কহেগা। হামারা জানকা দরদ তো হ্যায়।

সারথী বলল ঃ ভগোয়ানকা মর্জিসে জান তুম্হারা আচ্ছা রহেগা মিছিরজী। আবি তুমকা দোসরা এক কাজ করনা চাহি। তুম গিমটিকা অন্দর চলা যাও।

সভয়ে শম্ভূ শুধাল : কেঁও বাবুজী?

: ডরো মাত্। চলা যাও।

ভয়ে ভয়ে শম্ভূ গিমটি-ঘরে ঢুকল। সারথী দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে কড়া দুটো এঁটে ধরল। শম্ভূ আতংকে চেঁচিয়ে উঠল : কুছ কসুর হবে নেই বাবুজী, হামকো ছোড় দিজিয়ে—ছোড় দিজিয়ে—

সারথী আঙুল বাড়িয়ে ইংগিতে সকলকে পথ দেখিয়ে দিল। সকলে দ্রুত পদক্ষেপে পথে নামল। একটু পরে সারথীও একলাফে উঠান পার হয়ে পথে এসে দৌড়ে ওদের সাথে মিলল।

গিমটি-ঘরে আতংকিত শম্ভু মিছির তখনো জপছে বসে : রাম—রাম—রাম—

পরদিন দুপুরে শম্ভু ভয়ে ভয়েই স্কুলে হাজির হল। ব্যবস্থামত হেডমাষ্টার মশায়ও একে একে সবগুলি ক্লাস তাকে ঘুরিয়ে আনলেন। অনেকেরি বুক তখন ঢিপ ঢিপ করছিল। কিন্তু শম্ভু একটি ছেলেকেও আইডেণ্টিফাই করল না। বলল, এদের কেউ সেদিন রাতে ছিল না।

হেডমাষ্টার মশাই বিস্মিত হলেন। খুসীও হলেন। যথাসময়ে দারোগাবাবুর কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়ে একখানি চিঠি পাঠালেন। সংগে দিলেন কিছু ভেটসহ প্রচুর ধন্যবাদ। দারোগাবাবু চিঠিখানি পড়তে পড়তে ভ্রূ-কুঁচকে বললেন : ইডিয়েট !

আবর্ত

দিনে দিনে দিন বয়ে যায়। ‘জয়রথে-র গতি ক্রমে মন্দীভূত হয়ে আসে যেন। রথীদের উত্সাহের আগুন স্তিমিততর হয় দিনের পর দিন। সব কাযই চলে রুটিনের নিয়মে। লাঠি-শরকি তীর-ধনুক খেলা। সভা এবং শোভাযাত্রা। নানা কর্মপন্থার আলোচনা। তবু কিছুই তেমন জমাট বাঁধে না।

বর্ষা পার হয়ে আশ্বিন এসে পড়ল। কিন্তু কোথায় আক্রমণ

আর কোথায় সংগ্রাম। আকাশে দেখা দিল না কোন বম্বার। মেসিন-গানের কট্-কট্-কট্ শব্দ বাজল না কাণে। ড্রাম ও বিউগ্লের তালে নেচে উঠল না বুকের রক্ত। ভাল লাগে না এই স্বাদহীন এক ঘেয়ে জীবন। স্বপ্নময় কিশোরপ্রাণ চায় ছেদহীন উত্তেজনা, নিরবধি চাঞ্চল্য। অথচ তারি একান্ত অভাব এদের জীবনে। 'জয়রথ' একঘেয়েমীর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ল।

বড়রাও কোন সুস্পষ্ট সম্ভাবনার আশ্বাস দিতে পারে না। পাড়াগাঁয়ে টাট্‌কা খবরের একান্ত অভাব। ফলে গুজবের এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য। কেউ বলে, শীতটা পড়তে দাও না হে, রাশিয়ার বরফে ঠোক্কর খেয়ে বাছাধন হিটলারকে দ্বিতীয় সেণ্ট হেলেনায় যেয়ে হাঁপ ছাড়তে হবে। আবার কেউ বলে, আসুক না শীতটা, প্রাচীন রাজাদের দিগ্বিজয়ের সময়, জাপানী ট্যাংকের চাকা ঘড়-ঘড়িয়ে চলে আসবে ঢাকা কলকাতা বর্ধমান। এমনি সব উদ্ভট কাল্পনিক কাহিনী। তার যুক্তি-ভিত্তিও নাই, মাথা-মুণ্ডুও নাই। এতে ছেলেদের মন ওঠে না।

স্বরাজ কয়েকদিন হল বেড়াতে গেছে বোনের বাড়ী। সমীর বাবার সাথে কলকাতা গেছে দাঁত তুলতে। সারথীও আজকাল প্রায়ই বাড়ী থাকে। ওর মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। হলুদবাড়ীতে আছে শুধু রণধীর, সেবাব্রত, নীলাম্বর এবং কতকগুলি আরো ছোট ছোট ছেলে। 'জয়রথে'র কাযকর্ম তাই কয়েকদিন যাবত একেবারেই বন্ধ।

বিকেলে কার্যালয়ের ঘর খুলে রণধীর একাই বসে আছে চুপ করে। লাঠি, শর্‌কি, গুলী-বাঁশ, তীর-ধনুক সব অস্ত্রশস্ত্র সাজানো

রয়েছে ঘরের এক পাশে। চাঁপাডাঙা হতে সম্প্রতি ওদের কাছে একটা অনুরোধ এসেছে, সেখানেও একটি সমিতি গড়বার বিধি-বন্দোবস্ত করে দেবার জন্যে। তারি কতকগুলো কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে সামনের টেবিলে। কিন্তু তাতে রণধীরের মন নাই। কিছুই ওর ভাল লাগছে না। কত আশা, কত স্বপ্ন নিয়ে প্রায় বছর খানেক হল 'জয়রথ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রথম এর লক্ষ্য ছিল, গ্রামের তথাকথিত ছোটলোকদের ছেলেপিলে নিয়ে নাইট-স্কুল করা ; তাদের মধ্যে নিরক্ষরতা-বিরোধী অভিযান চালানো ; নিজেদের জন্যে গ্রন্থাগার পরিচালনা, বিতর্ক-সভার আয়োজন—এমনি কত কি।

রণধীর একটা নিশ্বাস ফেলল জোরে। অনেক সুখ-দুঃখের কথাই আজ মনে পড়ছে নির্জ্জন ঘরে : প্রথম প্রথম 'জয়রথে'-র কায বেশ পূর্ণ উদ্যমেই চলল। স্কুল হল, গ্রন্থাগার হল, হাতে লেখা কাগজ বেরুল, গরম গরম বিতর্ক চলল। বেশ। আনন্দ, উত্তেজনা, হৈ-চৈ। চমতকার। কিন্তু কিছুদিন মাত্র। ক্রমে সবি কেমন নিস্তেজ হয়ে এল। নাইট-স্কুলের ছাত্র কমল। শিক্ষকরাও মাঝে মাঝেই অনুপস্থিত। গ্রন্থাগারে বই পড়বার আগ্রহ গেল কমে। হাতে-লেখা কাগজ লিখবার মানুষের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

এমন সময় নতুন উত্তেজনা নিয়ে এল দেশব্যাপী আন্দোলন। স্কুল-কলেজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। কলকাতা সরগরম হয়ে উঠল নিত্য নতুন চাঞ্চল্যে। নানাস্থানের রেলপথ নষ্ট হয়ে গেল। থানা-আদালত রেলবাড়ী পুড়ল। কত গ্রেপ্তার হল। কত লোক গুলীর সামনে বুক এগিয়ে দিয়ে মৃত্যু বরণ করল।

সে জোয়ারের আঘাত এসে লাগল 'জয়রথে'র বুকে। চলল

রথ। জাগল রথীরা। এল সারথী। সুরু হল নতুন প্রাণ-প্রবাহ। আসন্ন সংগ্রামের জন্য আত্ম-প্রস্তুতি। হলুদবাড়ীর আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠল নবজাগরণের জয়ধ্বনিতে।

আবার এসেছে অবসাদ। চারদিক কালো করে নেমেছে একঘেয়ে ক্লান্তি। রণধীর হাঁপিয়ে উঠেছে এই অবসন্ন পংগুতায়। এর চেয়ে কলকাতা ভাল। অদ্ভুত, বিচিত্র, প্রাণ-চঞ্চল। আপন মনেই রণধীর বলে উঠল : নাঃ ভাল লাগে না,—আর ভাল লাগে না এখানে থাকা।

: এরি মধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছ রণু? কিন্তু প্রতিটি দিন আর রাত গুণে গুণে যারা এখানে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেয়, তাদের কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি কোন দিন?

ঘরে ঢুকল সারথী। রণধীর বলল : কখন এলে রথীদা?

চেয়ার টেনে নিয়ে সারথী বলল : এই আসছি। কিন্তু আমার কথার জবাব?

বিরক্তির সুরে জবাব দিল রণধীর : অন্যের কথা জানি না। কিন্তু আমি আর এখানে সত্যি থাকতে পারছি না রথীদা, আমার দম আট্‌কে আসছে।

চোখ তুলল সারথী : তোমার দম আটকে আসবে তা জানি। কারণ তুমি জন্ম-অভিজাত। জমিদার বংশের ছেলে। এ পাড়াগাঁ' অশিক্ষিত ছোটলোক চাষাদের জায়গা, তাদের জন্মভূমি। এখানে তোমাদের স্থানও নাই।

রণধীরের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। সারথীর দেওয়া আঘাত ওর পক্ষে অসহ্য। অশ্রুভরা গলায় ও বলল : আমাকে আঘাত

দিয়েই কি তুমি সুখ পাও রথীদা ? আভিজাত্যের কী তুমি আমার মধ্যে দেখেছ, যে সব সময়েই ওই এক খোঁটাই আমাকে দাও ?

: এতো খোঁটা নয় ভাই, প্রকৃত সত্য কথা।

রণধীর আবেগভরে বলল : না, না, এ সত্য নয়। আমি বড়লোকের বাড়ীতে জন্মেছি, তা ঠিক। কিন্তু কোন গরীবকে আমি এতটুকু ঘৃণা করিনা, আমার চেয়ে ছোট মনে করি না। আমি—

আর বলতে পারল না। গলা আটকে গেল। অভিমানের অশ্রুধারা নেমে এল দুচোখ বেয়ে।

সারথী আস্তে আস্তে বলল : সত্যি কথা প্রায়ই প্রিয় হয় না। আর অপ্রিয় সত্য তুমি সহ্য করতে পার না। বড় দুর্বল নরম তোমার মন।

রণধীর বাধা দিল : কি তোমার অপ্রিয় সত্য, যা আমি সহ্য করতে পারি না ?

: একবার তো বলেছি। আবার সে-কথা তুলে কোন লাভই নাই। অনর্থক তুমি কষ্ট পাবে।

চোখ মুছে রণধীর বলল : না, তুমি যে কারণ বলছ, সেজন্যে আমি হলুদবাড়ী ছাড়তে চাই না। তোমরাই আমাকে এখান থেকে যেতে বাধ্য করছ ?

: আমরা ? সারথীর কণ্ঠে বিস্ময়।

: হ্যাঁ। বিশেষ করে তুমি। কেন তুমি আজকাল এমন দূরে দূরে থাকো ? কোন কাজেই তোমার মন নাই। 'জয়রথে'র প্রতি পর্যন্ত তোমার আগের মত লক্ষ্য নাই। তাইতো সব এমন ঝিমিয়ে পড়েছে। তাই তো এমন বসে বসে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি।

সারথী কোন জবাব দিল না এ অভিযোগের। একটু চুপ করে থেকে বলল : তবে সত্যি কথাই বলি রণু, এ 'জয়রথ' আর আমাকে আকর্ষণ করে না।

রণধীর আকাশ থেকে পড়ল : বলো কি রথীদা ?

সারথীর গলা সহজ : ঠিকই বল্‌ছি। যে-সব ভাব ও আদর্শ নিয়ে এতদিন চলেছি, এই এক বছর গাঁয়ে বাস করেই সে-সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। মাদারীপুরে যখন পড়তাম, অনেক বড় বড় স্বপ্ন তখন দেখেছি। পরাধীন ভারতের শৃংখল মোচন করব। ধনী দরিদ্রের প্রভেদ ঘুচিয়ে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলব সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে। পৃথিবীর বুকে নব সভ্যতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রগামী সৈনিক হব। প্রয়োজন হলে অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দেব বিশ্ব-পাপ মুছে ফেলতে। রক্তবর্ণ প্রত্যূষে আকাশের দিকে চেয়ে মাস্টার মশায়ের সাথে একস্বরে কতদিন বলেছি : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।

সারথী দুই হাত জোর করে উদ্দেশ্যে প্রণাম করল। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল : কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, এত বড় স্বপ্ন দেখবার অধিকার আমার নাই। তার উপযুক্ত শক্তি নিয়ে আমি জন্মি নাই।

রণধীর আপত্তি জানাল : কেন তোমার এ-কথা মনে হয় রথীদা ? তোমার মত শক্তি—

জের টানল সারথী : বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় কারো নাই, কেমন ? সব ভাইরাই দাদার শক্তিকে বড় করে দেখে। কিন্তু রণু, তোমার অনেক দেখার মতই এ-দেখাটাও সত্যি নয়। আর,

কেন এ-কথা আমার মনে হয় ? এ-কথা আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমার আশেপাশের হাজার হাজার দীন দুঃখী দরিদ্র মানুষ। এদের জীবনে কত যে দুঃখ, তা বুঝি তুমি কোনদিন দেখনি রণুভাই। পেটে ভাত নাই। পরনে কাপড় নাই। মাথা গুঁজবার ঠাঁই নাই। অভাবে, অনটনে, অন্যায়ে, উতপীড়নে, মানুষ হয়ে জন্মেও এরা আজ পশু, তার চেয়েও হীন।

সারথী চুপ করল। রণধীরের চোখের জল শুকিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছে ব্যাথাতুর বিস্ময়। সংকোচের সংগে ও বলল : এদের দুঃখ দূর করা, এদের মানুষের অধিকার দেওয়াই তো 'জয়রথে'র লক্ষ্য। নয় কি রথীদা ?

: হ্যাঁ তাই। কিন্তু সে কবে হবে ? কবে এদের দুঃখ দূর হবে ? কবে এরা মানুষ হবে ?

: তারি চেষ্টাই তো আজ চলেছে পৃথিবী জুড়ে। যতদিন এ চেষ্টা ফলবতী না হয়, ততদিন অপেক্ষা তো করতেই হবে।

: কিন্তু আমি যে আর অপেক্ষা করতে পারি না রণুভাই। এদের দুঃখে আমার প্রাণ যে হাহাকার করে উঠেছে।

সারথীর গলা ভেজা। রণধীর চমকে উঠল। শুধাল : তুমি আজ এমন মুসড়ে পড়েছে কেন রথীদা ? তোমাকে তো এত ভেঙে পড়তে কখনো দেখি নি ?

সারথী বলল : সত্যি আমি ভেঙে পড়েছি রণু। এই মাত্র দেখে এলাম, আমাদের গাঁয়ের একটি কৃষকের একমাত্র ছেলে মারা গেল।

রণধীর বলল : তাতে—

: ভেঙে পড়বার কি আছে? একমাত্র ছেলে তো অনেকেরই মরে। নারে, এমনভাবে মরে না অন্য কোন দেশে। একটি গোটা সংসারের একমাত্র মাথা গুঁজবার আশ্রয় একখানি ভাঙা ছোনের ঘর। পাটকাটির বেড়া দেওয়া। সেই ঘরে কৃষকের একমাত্র ছেলে আজ মারা গেল নিউমোনিয়ায়। অথচ কাল সারারাত বৃষ্টির জল পড়েছে তার মৃত্যুশয্যায়, চালের ফুটো আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে। ওষুধ নাই, পথ্য নাই, চিকিত্‌সা নাই। তাও সহ্য হয়। কিন্তু বৃষ্টির জল থেকে বাঁচবার ঠাঁইটুকুও কি ওদের ভাগ্যে জুটবে না!

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। আবার কথা বলল সারথী: পথে পথে এই একটি কথাই বার বার মনে হচ্ছিল, আর হুহু করে কান্না পাচ্ছিল আমার নিজের অক্ষমতায়। অথচ এমন ঘটনা তো এই একটি মাত্র নয়। একখানি ভাঙা ছোনের কুঁড়েয় একটি পরিবারের জীবনযাপন এবং বৃষ্টির জলে ভিজে নিউমোনিয়ায় পুত্রের অকাল মৃত্যু—বাঙলার গ্রামে গ্রামে এমন মর্মন্তুদ ঘটনা তুমি কত চাও?

সান্ত্বনার সুরে কথা বলল রণধীর: এই সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার তুমিই বা কি করতে পার? কি করতে চাও?

হতাশার সুরে জবাব দিল সারথী: কিছুই করতে পারি না রণু, কিছুই পারি না। সে শক্তি নিয়ে জন্মি নাই। সেই তো আমার দুঃখ। তবু আমার কি মনে হয় জানো? এদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে না পারি, এদের সংগে মিশে, ভাই-বাবা-মা-বোন বলে ডেকে, এদেরি একজন হয়ে এদের দুঃখে সান্ত্বনা, বিপদে সাহায্য, রোগে সেবা তো করতে পারি।

সারথীর কথায় রণধীর ভয় পেল। প্রশ্ন করল: কিন্তু তাতে লাভ কি হবে?

: হয় তো কিছুই না। আর কিসেই যে কি লাভ হবে, আজ আমি তাও বুঝতে পারি না। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে অনেক কিছুই বুঝি। 'জয়রথ' বুঝি, সংগ্রাম বুঝি, মুক্তি বুঝি, বিশ্ব-পাপ মার্জনাও বুঝি। কিন্তু আমার মন আজ ঘুলিয়ে গেছে। শুধু একটা অন্ধ আবেগ অবিশ্রাম উদ্বেলিত হয়ে আবর্তের সৃষ্টি করে চলেছে। আজ আমি বুঝি শুধু মানুষের দুঃখ, মানুষের ব্যথা, মানুষের অসহায় ভাগ্য।

রণধীর তবু বলল: তোমার কথা ভাল বুঝতে পারছি না রথীদা।

সারথী জবাব দিল নির্লিপ্তভাবে: আমিও পারছি না। মনের কথা বাইরে বোঝাবার শক্তিও আমার নাই। হতে পারে আমি যা বুঝেছি, তাও ভুল। কিন্তু একটা কথা ঠিকই জেনো রণুভাই, দুঃখের অংশগ্রহণ করা দুঃখ দূর করার চেয়ে ছোট কায নয়। মাস্টার মশায়ের একটা কথাই ধ্রুবতারার মত আজ আমার মনের আকাশে জ্বল জ্বল করছে:

To spare an extra bone for the dog is good;
But to share the same bone with the dog
is better still.

আর আজ আমার মতে তাই best. নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

শান্ত সহজ ছোট্ট নদীটির মত বয়ে চলেছে হলুদবাড়ী গাঁয়ের নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা। তরংগ নাই। ঝড়ের দোলাও নাই।

'জয়রথ' নামমাত্র চলেছে, কাযে নয়। রণধীর পূজার ছুটির পরে কলকাতা চলে গেছে। তার স্কুল খুলেছে আবার। হেডমাস্টার মশায় কোথায় একটা হাই স্কুলে চাকরী পেয়ে হলুদবাড়ী মাইনর স্কুল ছেড়ে চলে গেছেন। অতএব গেছে নীলাম্বর। সারথী এখন নতুন স্বপ্নে বিভোর। গ্রামে গ্রামে ঘুরে দীন দরিদ্র দুঃখীদের সাথে সে দিন কাটায়। একটা হোমিওপ্যাথী ওযুধের বাক্স কোথেকে যোগাড় করেছে। নিজে নিজেই তাই দিয়ে চিকিতসা চালায়। যখন যা পায় খায়, যেখানে খুসী দিন কাটায়। হলুদবাড়ীতে তার দর্শন পাওয়া ভার। বাকী যে-সব রথীরা আজো আছে, তারাই কোনক্রমে ভাঙা হাট জাকিয়ে রেখেছে। 'জয়রথে'র দেহ আছে, প্রাণ নাই। চৈত্রের মজে-যাওয়া বোবা নদী যেন।

অকস্মাত এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে হলুদবাড়ীকে কেন্দ্র করে আবার উঠল উত্তেজনার ঝড়। ছেলে-বুড়ো সকলের মুখেই নেমে এল উদ্বেগের কালো ছায়া। দারুণ উতকণ্ঠা। হলুদবাড়ীব জীবন-নদীতে তরংগ উঠল আবার। দেখা দিল উদ্বেল আবর্ত।

হলুদবাড়ীর সরকাররা আর পার্শ্ববর্তী হাসারা গাঁয়ের চৌধুরীদের মধ্যে বংশগত বিবাদ। কোনকালে হয়ত জোত-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছিল। কালক্রমে নানা ছোটখাট দাংগা-হাংগামা ও আদালতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পথ ধরে সেই গোলযোগ এখন অকারণ শত্রুতায় পরিণত হয়েছে। সুযোগ পেলেই যে যখন পারে অন্যের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে।

হাসারা গাঁয়ের কানু মণ্ডল চৌধুরীদের ডান হাত। ও দেয়ারের

নমশূদ্রদের মধ্যে সে একজন মাতব্বর মানুষ। তার হাতের লাঠি বন্দুককে পিছু হটায়।

সম্প্রতি একটা জমির দখল নিয়ে সরকারদের কয়েক জন পাইক-পেয়াদা কানু মণ্ডলের লাঠির চোটে ফাটা মাথা নিয়ে হলুদবাড়ী ফির্‌ল। তারই প্রত্যুত্তরে সরকার মশায়ের নির্দেশে নিতাই পাল জনকয়েক বিশ্বস্ত লোক নিয়ে আঁধার রাতে কানু মণ্ডলের ঘরে দিল আগুন লাগিয়ে।

গ্রাম্য স্বার্থ-কলহে গৃহদাহ হামেশাই ঘটে থাকে। এ কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। কিন্তু ঘটনাটাকে ঘোরাল করে তুলল সুবল সাধু। ইচ্ছা করে নয়, নিয়তির দুর্লংঘ্য নির্দেশে।

কয়েকদিন হল সারথীর দেখা নাই। সুবল সাধুর মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। পাগলাটে এই ছেলেটার প্রতি তার কি যে মায়া পড়েছে। মাঝে মাঝে না দেখলেই বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। দুপুর থেকেই সাধুর মনটা হাসারা গাঁয়ের পথে ঘুরতে লাগল। পড়ন্ত বেলায় দেখা গেল বগলে থলি ঝুলিয়ে একতারাটা হাতে নিয়ে সুবল সাধু হাসারার দিকে চলেছে।

সাধুর আশা মিটল না। সারথী বাড়ী নাই। পাঁচ-ছয়দিন কোন খোঁজ নাই, বলল তার মা। দুঃখিত মনে সাধু ফিরতি পথ ধরল।

খানিক এগিয়েই দেখা হয়ে গেল কানু মণ্ডলের সাথে। কানু সমঝদার লোক। সাধুকে কিছুতেই ছাড়ল না। ধরে বাড়ী নিয়ে গেল। আজ রাতটা গান বাজনা করে কাটিয়ে দিতে হবে। অনেক দিন সে সাধুর গান শোনে নাই। সাধু তো আজকাল আর এ-তল্লাট মাড়ায় না।

অনেক রাত অবধি গান-বাজনার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের খোলা ঘরটায় শুয়েছে সুবল সাধু। হঠাত তার ঘুম ভেঙে গেল। কাদের যেন পায়ের শব্দ। সাধু কান পাতলো। কুটিল হিস্-হিস্ শব্দ। আস্তে উঠে সাধু উঠানে নামল। কারা যেন চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছে।

সাধু শুধাল : কে যায় ?

কানু মণ্ডলের বড় ছেলের ঘরে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। সেই আলোয় সাধু দেখল, সামনেই নিতাই পাল।

: একি ? পাল মশায় ?

ঠোঁটের উপর তর্জনী তুলে নিতাই পাল ফিসফিসিয়ে উঠল : চুপ। কর্তামশায়ের হুকুম। কথা যেন ফাঁস না হয়।

তড়িতবেগে নিতাই পাল সদলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুবল সাধুর ঠোঁটের উপর মুহূর্তের জন্য হাসি দেখা দিল। সংগে সংগে সে চেঁচিয়ে উঠল : আগুন—আগুন—

লোকজন এল। হৈ চৈ হল। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা তিনখানা ছোনের ঘর গ্রাস না করে নিভল না।

কানু মণ্ডল মনে মনে বুঝল সব। রুদ্ধ আক্রোশে বাইরের ঘরের দাওয়ায় সে গুম হয়ে বসে রইল।

পরদিন সন্ধ্যার পর সরকার মশায়ের খাস্ কামরায় সুবল সাধুর ডাক পড়ল।

গড়গড়ার নল ঠোঁটে রেখেই সরকার মশায় বললেন : সবই ত তুমি জান সাধু ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, পাল মশায়কে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এ কিন্তু ধর্মে সইবে না কর্তামশায়। ক্ষমতা থাকে—

গর্জে উঠলেন সরকার মশায় : থামো, ক্ষমতার হিসেব দিতে তোমাকে ডাকি নি। আমি যা বলছি তাই শোন। চৌধুরীরা আমার নামে ঘর-পোড়ার নালিশ রুজু করেছে, আর তোমাকে মেনেছে প্রধান সাক্ষী।

সুবল সাধু বলল : তা হবে।

: হবে নয়, তাই হয়েছে। এই মাত্র নিতাই ফিরেছে শহর থেকে। সেই খবর এনেছে আদালতে যেয়ে। শোন সাধু ঘর-পোড়ার মামলা বড় সাংঘাতিক। আর তোমার সাক্ষীর উপরেই মামলা নির্ভর করছে। তোমাকে আমার পক্ষ হয়ে সাক্ষী দিতে হবে।

সাধু প্রশ্ন করল : আপনার পক্ষ হয়ে ?

: হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার পক্ষ হয়ে। আদালতে তুমি বলবে, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। কে বা কারা আগুণ দিয়েছে আমি দেখি নি।

এবার সুবল সাধু গম্ভীর হয়ে উঠল। দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল : মিছে কথা আমি বলতে পারব না কর্তামশায়।

সরকার মশায় সাধুকে ভাল করেই চেনেন। এ বড় কঠিন ঠাঁই। তাই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন : এঃ, কী আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে। মিথ্যে তোমাকে বলতেই হবে।

সাধু নির্বিকার : আমাকে মাপ করবেন কর্তা মশায়। মিছে কথা বলা আমার গোঁসাইর নিষেধ।

'সরকার মশায় সুর নামালেন : আচ্ছা, আজ রাতটা সময় দিলাম। মাথা ঠিক করে ভেবে দেখগে। আমি তোমার মনিব।

আমার জন্যে আদালতে একটা মিথ্যে কথা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

সাধুর উত্তর স্পষ্ট : এর আর ভাবাভাবির কিছু নাই কর্তা-মশায়। সাক্ষী যদি দিতেই হয়, আমি হক কথাই বলব।

: সে হক কথার ফলে তোমার মনিব আমি, আমার যদি জেল হয় ?

: গোঁসাইর যা ইচ্ছে তাই হবে। আপনি আমি চাইলেই কি তা রদ করতে পারি ?

এত বড় স্পর্ধা! সরকার মশায় গম্ভীর গলায় বললেন : সাক্ষী তুমি দেবেই, আর তোমার জিবের উপরেও আমার হুকুম অচল। যা ইচ্ছে তুমি বলতে পার। কিন্তু মনে রেখো সাধু, এ মামলায় হক কথার দাম তোমার বুকের রক্ত। বুঝে কায করো।

মৃদু হেসে সাধু জবাব দিল : কর্তা মশায়, বাউল-বৈরাগী মানুষ আমরা, আমাদের বুকে তো রক্ত নাই, আছে রক্তজবা। তা সে তো গোঁসাইর শ্রীচরণেই অর্পণ করেছি। এখন তাঁর জিনিষ তিনি যদি নেন, তাতে আর আমার আপশোস কি বলুন ?

দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সরকার মশায় বললেন : আচ্ছা, তুমি তাহলে আসতে পার।

নমস্কার করে সুবল সাধু বেরিয়ে গেল। একটু পরে চোরের মত পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল নিতাই পাল। প্রণাম করে বলল : কি হল কর্তামশায় ? রাজী তো ?

: না হে নিতাই, এ বড় কঠিন ঠাঁই। পাখী বুলি ধরল না।

: এ্যাঁ, তাহলে আমার উপায়? নিতাই পাল সাত হাত মাটির নিচে সেঁধিয়ে গেল যেন।

সান্ত্বনা দিলেন সরকার মশায়: তোমার স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা তুমি ভেব না, সে ভার আমার। কিন্তু খুব সাবধান নিতাই, আমার নাম যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।

নিতাই পাল দিল আশ্বাস: সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কর্তামশায়। নিতাই সাতবার নরক দেখবে, তবু আপনার গায়ে আঁচড় লাগতে দেবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, শেষে আমার ভাগ্যে জেল—

আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সুবল সাধু একবার সরকার মশায়ের দিকে তাকাল। তাঁর দুচোখে আগুন জ্বলছে। সাধুর বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু ধর্ম সাক্ষী করে মিথ্যা কথা তার ঠোঁট দিয়ে বেরুল না। হক কথাই সে বলল।

আর—

আদালত থেকে ফিরবার পথে সে-দিন সন্ধ্যায়ই সুবল সাধু নিখোঁজ হয়ে গেল।

সন্ধানে

কয়েকদিন পরে।

অনেক রাতে বাড়ী ফিরে সারথী শুনল, এর মধ্যে একদিন সুবল সাধু এসেছিল তার খোঁজে। অমনি সে পা বাড়াল হলুদবাড়ীর দিকে। মায়ের নিষেধ শুনল না।

দেখা তবু হল না। বাগিচা ঘেরা কুঁড়ে ঘর শূন্য। দরজায় শিকল আঁটা। সারথী চেঁচিয়ে ডাকল : সুবল দা—সুবল দা—

কোন উত্তর নাই। নিঝুম দুপুর রাত, চারিদিকে জমাট অন্ধকার। সেদিকে চেয়ে সারথীর বুক কেঁপে উঠল অজানা আশংকায়।

পথ চেয়ে চেয়ে সারথী সারাটা রাত কাটিয়ে দিল ছট্‌ফট্‌ করে। এ-ঘরে এই প্রথম ও রাত কাটাল একা। এর আগে যখনই রয়েছে, সুবল সাধুর কোলে মাথা রেখেই ও ঘুমিয়েছে।

ভোর না হতেই সারথী পথে বেরুল। ক্রমে নানাজনের কাছে জানতে পারল সব। কানু মণ্ডলের গৃহদাহ, চৌধুরীদের মামলা, দারোগা পুলিশের আনাগোনা, সাক্ষী দিতে সুবল সাধুর সহরে গমন। সবই ও জানল। কিন্তু তারপর? সে খবর কেউ দিতে পারল না ভাল করে। সে-কথা কারো খেয়ালও হয় নি এ কয়দিন। গাঁয়ের কোণে গাছপালায় ঘেরা ছোট কুঁড়ে ঘরে মানুষটি আছে কি নাই, সে-খোঁজে কারই বা দরকার!

কিন্তু সারথীর যে বড় দরকার। কেমন একটা খটকা লাগল

ওর মনে। ঘটনার বিবরণ থেকে বোঝা যায়, সত্যনিষ্ঠ সুবল সাধু সাক্ষী দিয়েছে নিতাই পালের বিরুদ্ধে। ফলে সরকার মশায়ও তাতে জড়িয়েছেন। তারই ফলে কি সাধুর অন্তর্ধান? তবে কি এদের চক্রান্তে—

সারথীর মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। আর ও ভাবতে পারে না। সুবলদা নাই! না, সে অসম্ভব। সে আছে। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

সরকার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল সারথী। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই পাশের ঘর থেকে ডাকলেন সরকার মশায়: কে—রথী না?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। রথী ঘরে ঢুকল।

: কখন এলে? অনেক দিন যে তোমার দেখা নাই। কাল বৌমাও জিজ্ঞেস করছিল তোমার কথা।

: একটা কাযে এবার একটু অনেক দূরেই চলে গিয়েছিলাম। এদিককার কোন খবরই জানতাম না। কিন্তু একটা যে বড় ভাবনার কথা হয়ে পড়ল দাদু।

সরকার মশায়ের মাথাটা একটু কেঁপে উঠল। বাইরে সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপার?

: আজ দু'দিন হল সুবলদার কোন খোঁজ নাই। সেই তরশু তিনি সহরে গিয়েছিলেন সাক্ষী দিতে। তারপরের খবর কেউ দিতে পারে না। কি হল বলুন তো তাঁর? পারতপক্ষে একটা রাতও তো তিনি বাইরে কাটান না?

সরকার মশায় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন: তাই নাকি? আমিও কাল রাতে ভাবছিলাম সাধুর দেখা নাই কেন? কোথায় গেল সে?

দৃঢ়স্বরে বলে উঠল সারথী : কোথাও তিনি যান নি। এই গাঁয়েই আছেন। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে কেউ তাঁকে আট্‌কে রাখতে পারবে না। তা হবে না।

সরকায় মশায় লঘু বিরক্তির সংগে বললেন : একি ? তুমি হঠাৎ এমন চেঁচিয়ে উঠলে কেন রথী ? হল কি তোমার ?

ব্যাপারটা বুঝতে পেয়ে সারথী লজ্জিত হল। বলল : আমার কেমন ভয় করছে দাতু। কেবলি মনে হচ্ছে, এর পিছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে। মামলার সাক্ষী দেওয়ার সংগে সুবলদার নিরুদ্দেশের একটা সম্পর্ক আছে।

সরকার মশায় ধীরে অথচ তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন : তুমি কি তাহলে বলতে চাও রথী, যে আমি সাধুকে গায়েব করেছি ?

: এতবড় কথা বলবার ধৃষ্টতা আমার যেন কোনদিন না হয়। কিন্তু আমার মন বলছে, এর তলে তলে নিতাই পাল মশায়ের হাত আছে।

সুর নরম করলেন সরকার মশায় : এ তোমার অন্যায় রথী। হতে পারে নিতাই মামলাবাজ মানুষ। কিন্তু তাই বলে না জেনেশুনে নিছক একটা লোকের নামে এ অপবাদ দেওয়া ঠিক নয়।

: নিছক তো নয় দাতু। সুবল দা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছেন। সেই আক্রোশে—

হো হো করে হেসে উঠলেন সরকার মশায় : আরে রামচন্দ্র, সে তো একটি গাঁজাখোর বৈরাগী মানুষ। তার আবার সাক্ষী। মামলা তো ফেঁসে গেল বলে।

সারথী অপ্রস্তুত হল : তাহলে কোথায় গেল সে লোকটা ? হাওয়ায় তো মিশে যেতে পারে না ?

মৃদু হাসি সরকার মশায়ের ঠোঁটে : হয়তো গেছে একদিক চলে তীর্থধর্ম করতে। চাই কি, হয়তো গয়া-কাশী করেই একদিন এসে হাজির হবে।

এ-সব কথা সারথীর ভাল লাগছিল না। সরকার মশায়ের কথাও কেমন যেন রহস্যময়। ব্যাপারটাকে তিনি যেন কিছুই হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে চান। অথচ সুবল সাধুর নিরুদ্দেশের কথা নিয়ে এর আগে যার সংগেই ও আলোচনা করেছে, সেই ওর মতে সায় দিয়েছে। সবাই চিন্তিত হয়েছে। সবারই মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়েছে। সরকার মশায়ের ব্যবহারে তাই সারথীর মনের ধারণা আরো বদ্ধমূল হল। কিন্তু এ নিয়ে এখানে বাদানুবাদ অর্থহীন। ও চুপ করে বসে রইল। চিন্তার সাগরে ওর খেই হারিয়ে গেছে।

একটু পরে সারথী উঠে দাঁড়াল।

সরকার মশায় বললেন : কোথায় চললে আবার ?

: আজ্ঞে, সুবলদার ওখানে। দেখি যদি কোন খোঁজ খবর পাই।

বিরক্তকণ্ঠে সরকার মশায় বললেন : আর একটু বস রথী। তোমাকে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

: বলুন।

: দেখ রথী, অন্য কেউ হলে বলতাম না। দাদু বলে ডেকেছ বলেই, কথাটা তোমায় বলছি। কিছুদিন যাবতই লক্ষ্য করছি, আজকাল তুমি বড়ই উচ্ছৃংখল হয়ে পড়েছ। কোথায় থাক, কোথায় ঘোরো। সময়মত খাওয়া নাই। সময়মত ঘুম নাই। এ তোমার কি ভাব ?

সারথী ধীরে ধীরে বলল : আমি গরীব মানুষ। গরীবদের সংগেই ঘুরি ফিরি, থাকি। আর খাওয়া-নাওয়া! সে সব এত বিচার করলে কি আমাদের চলে দাদু ?

সারথীর স্পষ্ট কথায় সরকার মশায় আহত হলেন : আচ্ছা রথী, আমাদের এখানে কি তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে ?

: অসুবিধা ? আপনার দয়ায় আমি তো রাজার হালে আছি।

: একে তুমি দয়া বলছ রথী ? সত্যি কি তাই ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। শিকল সোনার হলেও তা শিকলই, অলংকার নয়।

সরকার মশাই এবার পাল্টা আক্রমণ করলে : শিকলই যদি মনে কর তবে তা গলায় পরো কেন ?

একটু ইতস্ততঃ করে সারথী উত্তর দিল : কারণ—পাঁঠার ইচ্ছা ঘাড়ে কোপ নয়। আপনার এ রাজভোগ আমার শাস্তি, তা কি আপনি অস্বীকার করবেন ?

আঘাতের পর আঘাতে স্নেহশীল বৃদ্ধের চোখ ছলছলিয়ে উঠল : শুধু তোমার দিকটাই দেখছ রথী। আর আমাদের স্নেহ, ভালবাসা —তার কি কোন দাম নাই ?

: দাম থাকত, যদি আমিও আপনার মত বিত্তশালী বড় লোক হতাম। কিন্তু আমি যে গরীব। আমার প্রতি আপনাদের স্নেহ-ভালবাসাও দয়ারই রূপান্তর। সে দয়া শিকলের মত আমার গলা আটকে ধরে। আমি ছটফট করে উঠি।

: ওঃ! সরকার মশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ধীরে

ধীরে বললেন ঃ বেশ। তোমার শৃংখল আমি খুলে দিলাম। তুমি যেখানে খুসী যেতে পার সারথী।

রথী আবার সারথী হয়ে গেল। কথাটা সারথীর কানে বড় লাগল। ও চুপ করে রইল।

কিন্তু চুপ করে থাকলে তো চলবে না। সুবল সাধু এখনো নিরুদ্দেশ। কোন্ অবরুদ্ধ অন্ধকারে বসে যেন অবিরাম সারথীকে ডাকছে উদ্ধারের আশায়।

সারথী বলল : আমি তা হলে যাই। আমার মন আজ বড় অস্থির। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

সরকার মশায়কে প্রণাম করে সারথী ধীরে ধীরে চলে গেল। দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করে বারোটা বাজল।

একটু পরে একটা চামড়ার স্যুটকেস হাতে নিয়ে সারথী আবার ঘরে ঢুকল। স্যুটকেসটা ফরাসের উপর নামিয়ে বলল : এই স্যুটকেসটা আমার কাকা আমাকে দিয়েছিলেন একবার পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছিলাম বলে। এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি!

সরকার মশায় কোন কথা বলেলন না। স্যুটকেসের ভিতরে ছোট একটা কৌটা থেকে একখানি গিনি বের করে সারথী সরকার মশায়ের ডেস্কের সামনে রাখল। বলল : শুনেছি এই গিনি দিয়ে আমার ঠাকুর্দা বাবার মুখ দেখেছিলেন। বাবাও এই গিনি দিয়ে আমার মুখ দেখেছিলেন। গিনিটা তাই আমি সাথে সাথেই রাখি। আর কোন সম্পত্তি তো আমার নাই। এই গিনিটা আমি রণুভাইকে দিয়ে গেলাম। সে এলে তাকে দেবেন।

হন হন করে সারথী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সরকার মশায়ের চোখের জলে গিনিটা আবছা হয়ে এল।

সন্ধ্যা।

একটা পোড়ো বাড়ীতে 'জয়রথে'র সভা বসেছে অনেকদিন পরে। সবাই নয়, বাছা বাছা কয়েকজন মাত্র রথী সভায় উপস্থিত। সভা ডেকেছে সারথী নিজে।

রাত আটটা বাজে। ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা এই বাড়ীটাতে এরই মধ্যে নেমেছে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা। বাইরে শিশির পড়ছে টুপ্‌টাপ্ করে। ঘরের মধ্যে বেড়ায় ঝোলানো রয়েছে ছুটি কালি-পড়া হ্যারিকেন। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন ওরা। সাদা কেরোসিনের অভাবে হ্যারিকেনে জ্বালানো হয় লাল তেল। তারই ফলে বাতিতে আলোর চেয়ে ধোঁয়ার মাত্রা বেশী। ধোঁয়া-ঢাকা লাল্‌চে আলোয় ঘরখানি কেমন যেন ছম্ ছম্ করছে। ঠাণ্ডা মেঝেয় মাছুর পেতে বসেছে রথীবৃন্দ। তাদের কালো কালো ছায়া দেয়ালে এঁকেছে ভূতের ছবি। সবারই চোখে মুখে উদ্বেগ। কেমন একটা বিপন্ন ভাব।

কথা বলল সারথী—কণ্ঠে তার ঝড়ের সংকেত: একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনার জন্যে এই সভায় আমরা সমবেত হয়েছি। তোমরা সবাই জানো, আজ তিনদিন পার হয়ে গেল, সুবলদার কোন খোঁজ নাই। আর তার এই নিরুদ্দেশের সংগে ঘর-পোড়া মামলার যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সে বিষয়ে তোমাদের কোন সন্দেহ আছে?

সকলে জানাল—না।

: তাহলে ভাইসব, এ অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি? কি ভাবে আমরা সুবলদার সন্ধান পাব? তাঁকে উদ্ধার করব এই সব হীন ষড়যন্ত্রকারীদের কবল থেকে?

সভা নিস্তব্ধ। কারো মুখে কথা নাই। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সারথী আবার সুরু করল: আমার মনে হয় একটিমাত্র পথ আমাদের সামনে খোলা আছে। সে-পথ নিতাই পালের টুঁটি চেপে ধরা। ওই ব্যাটা ছোটলোক মামলাবাজ, নিশ্চয় জানে সুবলদার খবর।

কথা বলল স্বরাজ: একটা কথা তুমি ভাবছ না রথীদা, যে একটা মানুষকে জলজ্যান্ত হাওয়ায় মিশিয়ে দেবার ক্ষমতা বা স্পর্ধা নিতাই পালের মত ছিঁচকে মানুষের হতে পারে না। নিশ্চয় এর পিছনে আছেন স্বয়ং সরকার মশায়।

এ-কথায় সকলে মাথা দোলাল। চিন্তিত মুখে সারথী বলল: তুমি যা বলেছ স্বরাজ তা আমারো মনে হয়েছিল। তাই দুপুরে আমি সরকার মশায়ের কাছে গিয়েছিলাম-ও। কিন্তু তোমরা তো জান, আমি কত অসহায়। সংসারের স্বার্থ-কলহের বিচারে তাঁর যত দোষই থাক, আমার প্রতি এই পুত্রহীন বৃদ্ধ যে কত স্নেহশীল তা তো তোমাদের অজানা নাই। তাই সেখানে কিছুই আমি করতে পারব না। আমার লক্ষ্য ওই নিতাই পাল। যেমন করে পারি, ওর কাছ থেকেই সুবলদার সংবাদ আমি নেব।

সেবাব্রত শুধাল: নিতাই পালকে তুমি কি এতই সরল মানুষ পেয়েছ রথীদা, যে তার কাছে গেলেই সে তোমাকে সব কথা বলে দেবে? তোমাদের অনুমান যদি সত্যি হয়, সরকার মশায় যদি

এর পেছনে থেকে থাকেন, তাহলে প্রাণ গেলেও সে সুবল সাধুর কথা ফাঁস করবে না।

কঠিন হাসি হেসে সারথী বলল : প্রাণ যাওয়া এত সোজা নয় রে সেবা, প্রাণ মাটির ঢেলা নয়। অপরকে বাঁচাবার জন্যে যে প্রাণ দিতে পারে, সে-মানুষ নিতাই পাল নয়। .নিতাই পাল তো নরকের কীট। সে-মানুষ থাকে স্বর্গে।

সারথীর প্রদীপ্ত কথার স্ফুলিংগের কাছে সকলের কথাই ম্লান হয়ে যায়। সারথী উত্তেজনাভরে বলল : তুই দেখে নিস সেবা, প্রাণের ভয়ে ওই নিতাই পাল কেমন করে লক্ষ্মীছেলের মত সব কথা বলে দেয়। তোমরা ভয় পেয়ো না ভাইসব, যা করবার আমিই করব। আমার এই পাঁচটা আঙুলই নিতাই পালের টুঁটি চাপবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি শুধু চাইছি তোমাদের সকলের অনুমতি, তোমাদের সহানুভূতি। কারণ নিতাই পালকে ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি হলেও এখানে এ নাটকের শেষ হবে না। এর ফল হয় তো ভোগ করতে হবে তোমাদের সবাইকে। কে জানে, হয় তো এর ফলে 'জয়রথে'র চাকাও কেঁপে উঠবে।

স্বরাজ অনেকক্ষণ ধরেই একটা কথা বলব বলব করছিল। সাহসে কুলায় নাই। সুযোগ পেয়ে এবার সে বলে উঠল : তবেই ভেবে দেখ রথীদা, এ-ব্যাপার নিতাই পালকে ছাড়িয়ে সরকার মশায় পর্যন্ত পৌঁছুবেই। আর সরকার মশায়ের বিষ-নজরে পড়লে হলুদবাড়ীতে 'জয়রথে-'র চাকা তিন দিনও সচল থাকবে না। জানো তো সেবার কালী-মণ্ডপের সভায় কি কাণ্ড বেধে উঠেছিল। ভাগ্যে রণু সেদিন ছিল, তাই রক্ষা।

উপস্থিত সকলের মনেই সরকার মশায়ের অগ্নি-চক্ষু ও বজ্র-গর্জনের স্মৃতি ভেসে উঠল। সকলেই আর একবার শিউরে উঠল অজানা আশংকায়।

স্বরাজের এই পরোক্ষ আঘাতে সারথীর উত্তেজিত বুকটা খচ করে উঠল। মুখে ফুটে উঠল ব্যথার রক্তিমাভা। একটু চুপ করে থেকে বলল দরদী গলায় : সুবলদা আমাকে ছোট ভায়ের মত স্নেহ করেন। তাই তাঁর উদ্ধারের জন্য আমার মন পাগল হয়েছে। তোমরা হয় তো মনে করছো, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি তোমাদের সবাইকে বিপদের মুখে টেনে নিতে চাইছি। কিন্তু তা সত্য নয়। সুবলদার উদ্ধার কেবলমাত্র কোন সভ্য-বিশেষের ভায়ের উদ্ধার নয়। শক্তিমান অত্যাচারীর কবল হতে অসহায় ভালমানুষকে রক্ষার এই আদর্শই 'জয়রথে'র প্রাণ। আমার বিশ্বাস ছিল, সে-আদর্শকে অম্লান রাখতে 'জয়রথে'র রথীরা অনায়াসে যে-কোন বিপদকে বরণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু দেখছি, আমার সে ধারণা ভুল।

বাধা দিল স্বরাজ : না, ভুল নয়। তুমি আমায় ভুল বুঝেছ রথীদা—

প্রতিবাদ জানাল সারথী : ভুল বোঝাবুঝির এতে কিছু নাই স্বরাজ। এ-আমার অন্তরের নির্দেশ। একে আমি পালন করবই। আর ভেবো না যে, তোমাদের সংঘ-শক্তির উপর নির্ভর করে এ কাযে আমি হাত দেব। নিতাই পালের শয়তানীর জাল ছিঁড়ে সুবলদাকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা তোমাদের আশীর্বাদে আমার একারই আছে। এসো না তোমরা কেউ আমার সাথে। শুধু চেয়ে

দেখ, সারথী শুধু মুখেই আস্ফালন করে না, নিজের পায়ে ভর দিয়ে কায করতেও সে জানে।

তবু স্বরাজ বলল : তুমি আমায় ভুল বুঝলে রথীদা? আমি বলতে চেয়েছিলাম, 'জয়রথ'কে বিপদের মুখ হতে বাঁচিয়ে যদি কার্যসিদ্ধি হয়—

· তা হয় না স্বরাজ, তা হয় না। ভাল-মন্দ বিচার করে আর আমি অপেক্ষা করতে পারি না। তোমরা ভুলে যাচ্ছ, আজ তিনদিন যাবত সুবলদা নিখোঁজ। কে জানে, আজো তিনি বেঁচে আছেন কিনা।

সারথীর গলা ভিজে উঠল। কেউ কোন কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। এক সময় সেবাব্রত বলল সসংকোচে : আচ্ছা রথীদা, একটা কায করলে কেমন হয়?

সারথী চোখ তুলল : কি?

মিনতির সুরে কথা বলল সেবাব্রত : তুমি আর একটা দিন অপেক্ষা কর। রণুকে খবর দিয়ে নিয়ে আসি।

: কি করবে রণু এসে? হতাশভাবে শুধাল সারথী।

সেবাব্রত জবাব দিল : ব্যাপারটা যখন সরকার মশায় পর্যন্ত গড়াবেই, তখন রণু আব্দার ধরলে হয়তো খোদ গোড়া থেকেই সুবল সাধুর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

সকলেরই মনের আকাশে এ-প্রস্তাবে আশার সূর্যোদয় হল। সারথী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল : সব তুই গুলিয়ে দিলি সেবা। সত্যি, আমারো মনে হচ্ছে, রণু ভাই এলেই যেন সব গোল মিটে যাবে। তাছাড়া, 'জয়রথ' তার অনেক স্বপ্ন দিয়ে গড়া। তাকে

না জানিয়ে 'জয়রথে'র বিপদ ডেকে আনাও তো ঠিক হবে না। কি বলো তোমরা?

সকলেই সেবাব্রতের প্রস্তাবে রাজী। ঠিক হল, রাত এগারটার ট্রেণেই একজন কেউ সহরে যেয়ে রণধীরকে টেলিগ্রাম করবে। তাহলেই পরদিন সন্ধ্যার ট্রেণে সে হলুদবাড়ী পৌঁছে যাবে।

মনের কষ্ট মনে চেপে রেখে সারথীও এতে সম্মত হল। মনে মনে বলল: আরো একটা দিন তুমি থাকো সুবলদা, তারপর—

রাবণ ঘর

সভাগৃহ নির্জন। একে একে সবাই চলে গেছে। বেড়ার গায়ে এক কোণে জ্বলছে একটা ধূমমলিন হ্যারিকেন।

জোড়-আসন করে স্তব্ধভাবে বসে আছে সারথী। মাথাটা অসহায়ভাবে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। শরীর স্থির। যেন প্রাণহীন।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এমনিভাবে। আচমকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও উঠে দাঁড়াল। কোণ্ থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে পা বাড়াতেই দরজার কাছে আবছা আঁধারে উঠে দাঁড়াল আর একটি মূর্তি।

বিস্মিত হল সারথী: কে রে? সেবা? তুই কেন বসে আছিস্ এতক্ষণ?

ভীরু চোখ তুলল সেবাব্রত: তোমাকে একা রেখে—

নরম গলায় বাধা দিল সারথী : দূর্ পাগলা ? এ রকম একা থেকে আমার অভ্যাস আছে।

কথা বলতে বলতে তুজনে পথে নামল। বাইরে শীতার্ত রাত। আশেপাশে চারদিকে স্তূপ স্তূপ ঠাণ্ডা অন্ধকার। সে জমাট আঁধার যেন হাত দিয়ে ধরা যায়। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হয়, অন্ধকারের প্রাচীরে বুঝি বা ঠোকাঠুকি লাগবে।

জড়সড় হয়ে তুজন চলেছে। সারথী কথা বলল : আমাকে একলা রেখে আর সবাই চলে গেল। তবে তুই কেন গেলি না সেবা ?

সেবাব্রত জবাব দিল : বাঃ, তুমি যে আমার দাদা।

: ঠিক বলেছিস্। আচ্ছা সেবা, রণু আজ সভায় থাকলেও বোধ হয় তোর মতই বসে থাকত, নারে ?

সেবাব্রত সোৎসাহে বলল : নিশ্চয় থাকত। সত্যি রথীদা, রণু তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি তো ইদানীং এখানে থাকতে না। দিনরাত কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতে। রণু সেজন্য কত তুঃখ করেছে আমার কাছে। বলে : আমার কি মনে হয় জানিস্ সেবা, আর জন্মে নিশ্চয় রথীদা আমার আপন ভাই ছিল।

সারথী অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল তুটি কথা : আপন ভাই।

পথের ও-পাশ হতে ভেসে এল কার যেন বেসুরো সংগীত :

মনে করো শেষের সে-দিন ভয়ংকর,
অবসন্ন দেহ হইবে তোমার,—
সেই দিনে,
সেই ক্ষণে,

যদি বলতে পার হরিনাম,
হরি পুরাইবে মনস্কাম,
অন্তে পাবি মোক্ষধাম।

চমকে উঠল সারথী : ও কার গলা রে সেবা ?

সেবাব্রত কান পেতে বলল : ওই তো নিতাই পালের গলা। অন্ধকারে নিশ্চয় ভয় পেয়ে গান ধরেছে। নইলে নিতাই পাল গাবে গান !

সেবাব্রত হেসে উঠল। কিন্তু সারথীর মাথায় রক্ত উঠল চড়াক্ করে। নিতাই পাল ! মামলাবাজ শেয়াল। সারথীর দাঁত কড়মড় করে উঠল। হাতের আঙুল মুষ্টিবদ্ধ। ফিস্ ফিস্ করে বলল : সরে আয় সেবা ?

সেবাব্রত ভয় পেয়েছে : কোথায় যাবে রথীদা ?

আস্তে। ওই বকুল গাছটার পাশে লুকো।

সেবাব্রতকে হাত ধরে টেনে নিয়ে সারথী পথ থেকে নেমে পড়ল। গাঢ় অন্ধকার ওদের ঢেকে ছিল।

ভয়ে-কাঁপা বেসুরো গলায় গান গাইতে গাইতে নিতাই পাল এসে পড়ল। গলায়-মাথায় সুতির মাফলার জড়ানো। গায়ে সরকার মশায়ের দেওয়া পুরানো বালাপোষ। হাতে ছোট হ্যারিকেন। নিভু নিভু করে জ্বালানো। যাতে কেরোসিনও না পোড়ে, আবার পথ দেখাটাও চলে কোনগতিকে ।

ক্ষুধিত বাঘের মত সারথী লাফিয়ে পড়ল নিতাই পালের ঘাড়ে। নিতাই পাল চীতকার করে উঠল : কে ? এ-এ-এ—

সারথী ততক্ষণ করাল মুষ্টিতে নিতাই পালের গলা চেপে ধরেছে।

ফিসফিসিয়ে বলল : চুপ। একটি শব্দ করবে কি মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

নিতাই পাল সামলে নিয়েছে : কে সারথী? আঃ বাঁচলাম বাবা। আমি ভেবেছিলাম, কি-জানি কে! তা বাবাজী, গলাটায় বড় লাগছে, একটু হাঁপ ছাড়তে দাও।

হাত ঢিল করে সারথী শুধাল চাপা গর্জনে : বল সুবলদা কোথায়?

নিতাই পাল আকাশ থেকে বলল : কে? সুবল সাধু? কই না, তার সাথে তো আমার দেখা হয় নি।

: ন্যাকামী রাখো। বল তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

: লুকিয়ে? তুমি বলছ কি বাবাজী, আমি তাকে লুকিয়ে রাখব কোথায়? এতটুকু কুঁড়ে ঘরে আমি থাকি—

সারথীর মাথায় আগুন জ্বলছে। গলায় মাফলারের ফাঁস আরো চেপে ধরে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে বলল : থাক্। শিগগির বল সুবলদা কোথায়। নইলে খুন করে ফেলব।

নিতাই পাল ত ঘুঘু কম নয়। তবু মচকাল না। বলল : খুনই করো আর জখমই করো, যা জানি না তা বলব কেমন করে বাবাজী?

আর সহ্য হল না সারথীর। 'তবে মর'—বলে এক ধাক্কায় নিতাই পালকে ফেলে দিলে মাটিতে। বিদ্যুৎগতিতে চেপে বসল তার বুকের উপর। উদ্যত ঘুসি তার মুখের উপর তুলে তীব্রকণ্ঠে বলল : বাঁচতে চাও তো এখনো বল, কোথায় সুবলদাকে রেখেছ।

মিথ্যার বালি দিয়ে গড়া প্রাচীর কখনো সুদৃঢ় হয় না। নির্জন আঁধারে শক্তিমান হাতের উদ্যত ঘুসির সামনে নিতাই পালের প্রভু-ভক্তি ধূলার প্রাসাদের মত ভেঙে পড়ল। গোঁ গোঁ করে সে বলল : বলছি—বলছি। উঃ, আমার বুকের হাড় যে ভেঙে গেল। একটু ছেড়ে দাও বাবা—

বুকের উপর আরো একটু চাপ দিল সারথী : চেঁচিও না। বল কি করেছ সুবলদাকে নিয়ে ?

টেনে টেনে জবাব দিল নিতাই পাল : কোন চিন্তা করো না বাবাজী, সুবল সাধু সুস্থ শরীরেই বেঁচে আছে।

: কোথায় ? আগ্রহের আতিশয্যে সারথী নিতাই পালকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নিতাই ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বসল।

: বল কোথায় তাকে রেখেছ ?

একটু চুপ করে থেকে একান্ত অসহায়ভাবে নিতাই পাল সারথীকে জড়িয়ে ধরল। বলল : বাবা সারথী, আমি ছাঁ-পোষা গরীব মানুষ। সে-কথা বললে আমার ভিটে-মাটি উচ্ছন্নে যাবে। আমি ধনে-প্রাণে মারা যাব।

সারথী আশ্বাস দিল : তোমার কোন ভয় নাই পাল মশায়। এ-কথা অন্য কাক-পক্ষীর কানেও যাবে না। তুমি নির্ভয়ে বল সব কথা। বল, কোথায় এখন সুবলদা আছে ?

ইতস্তত করে বলল নিতাই পাল : সরকার বাড়ীতে।

রুদ্ধশ্বাসে সারথী প্রশ্ন করল : সরকার বাড়ীতে কোথায় ?

: রাবণ ঘরে।

: রাবণ ঘরে! সবিস্ময়ে একসংগে উচ্চারণ করল সারথী ও সেবাব্রত। সে-স্বরে অন্ধকার থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল যেন।

সারথীর ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে এবং সারথীর সুদৃষ্টি লাভের লোভে নিতাই পাল ঘটনার যে বিবরণ দিল, তা সংখেপে এই :

রাবণ ঘর সরকার বাড়ীর জমিদারী-বিচারের হাজত ঘর। সরকার মশায়ের শয়ন-কক্ষের পাশে একটি নিশ্ছিদ্র ছোট ঘর আছে। তার মেঝেতে আছে গুপ্ত-দ্বার। সেই গুপ্ত-দ্বার খুললেই দেখা যাবে কংকালের দাঁতের মত ছোট ছোট সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেই আলো-বাতাসহীন ঠাণ্ডা ঘর। সেই রাবণ ঘর।

সরকার মশায়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে মনিবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ায় সুবল সাধুকে পথ হতে ধরে এনে আটক রাখা হয়েছে রাবণ ঘরে। উৎপীড়ন দূরে থাক, বেশ সুহালেই সে আছে। উদ্দেশ্য তাকে হাত করে চৌধুরীদের নামে পাল্টা একটা মিথ্যা মামলা রুজু করা। সুবল সাধুকে আবার সাক্ষী দিতে হবে যে, চৌধুরীদের টাকা খেয়েই সে মিথ্যা কথা বলেছে আদালতে, আসলে সে ঘর-পোড়ার কিছুই জানে না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ সুবল সাধু তাতে সম্পূর্ণ গররাজী। সে মরবে, তবু মিথ্যা সাক্ষী দেবে না।

সব শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হল সারথী। নিতাই পালকে ছেড়ে দিল অভয়-বাণী শুনিয়ে : তোমার কোন ভয় নাই পাল

মশায়। আমরা তিনজন ছাড়া আর চতুর্থ প্রাণী এ কথা জানবে না। তোমার কোন বিপদ হয়, সে জন্য আমি দায়ী রইলাম।

অর্থহীন হাসি হেসে নিতাই পাল আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে দিকে চেয়ে সারথী বলল : বেচারা।

আবার দুজন এগিয়ে চলল আগে-পাছে। এক সময় কথা বলল সেবাব্রত : তোমার এ-সব ব্যাপার দেখে আমার বড় ভয় করে রথীদা।

মৃদু হেসে সারথী বলল : কেন রে ? আমি মরে যাব বলে ?

: তুমি হেসো না রথীদা। সত্যি বলছি, কোন্‌দিন তুমি যে কি কাণ্ড করে বসবে, ভেবে আমার গা কাঁপে।

সব চুপ। শুধু হ্যারিকেনের আলোটা আঁধারের গায় প্রেতায়িত ছায়া ফেলে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যায়। কেউ কোন কথা বলে না অনেকক্ষণ।

নৈঃশব্দ ভংগ করল সারথী. কি জানিস্‌ সেবা, চারিদিকে মানুষের অবিরাম হাহাকার আর শোচনীয় নীচতা দেখে দেখে জীবনের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। বেঁচে থাকতে আর আমার ভাল লাগে না। দুঃখ আছে, অথচ তার প্রতিকারের ক্ষমতা নাই. এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।

আপন মনেই সারথী বলে গেল কথাগুলো। সেবাব্রত শুনল, কোন জবাব দিল না। অভিমানে ওর বুকটা ফুলতে লাগল।

আবার কথা বলল সারথী। আজকের এই প্রেত-অন্ধকারের ছায়ায় ওর মন মুখর হয়ে উঠেছে : শোন্‌ সেবা, জীবনে কোন সাধই তো মিটল না। কোন স্বপ্নই সফল হল না। কিন্তু মৃত্যুকে

ঘিরেও আমার মনে একটা সাধ আছে, সেটাকে যেন তোরা অপূর্ণ রাখিস্ না।

ব্যথিত কণ্ঠে শুধাল সেবাব্রত : কি ?

: দ্যাখ্, মানুষের পায়ের তলায় পড়েই তো জীবনটা কাটল। মরবার পরেও যেন আমাকে তেমনি পায়ের তলায়ই শুইয়ে রাখিস্ না। আমাকে পোড়াবি দাঁড়ানো ভাবে, শুইয়ে নয়।

সেবাব্রত বাধা দিল : কি যে তুমি বলছ আজ ?

: সত্যি রে সেবা, বড় ভাল লাগে আমার ভাবতে। চারপাশে সাজানো চন্দন কাঠের চিতা। তার মাঝে আমি দাঁড়িয়ে আছি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে। আগুনের লালশিখা আমার বুকের রক্তিম প্রণাম বয়ে নিয়ে চলেছে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে !

সেবাব্রত অশ্রুসিক্ত গলায় ডাকল ধীরে : রথীদা—

সে-ডাকে সারথীর ধ্যান ভাঙল যেন। আকাশ হতে ও নেমে এল মাটিতে। বলল : ওঃ। আর শোন্, আমি মরে গেলে ওই 'হরি হরি বলো—হরি বোল' শব্দে আমার কান ঝালাপালা করিস না যেন। বরং আগুনের সহস্র শিখা যখন পাগলা হাওয়ার তালে সুর তুলে ক্রমে আমাকে ঢেকে ফেলবে, তখন তোরা সকলে মিলে আবৃত্তি করিস কবিগুরুর কবিতা।

সারথীর চোখে সুদূর স্বপ্নের নীলাঞ্জণ। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ও আবৃত্তি করল কয়েকটি লাইন ঃ

বিসেরি বা সুখ
কদিনের প্রাণ ?
ওই উঠিয়াছে
সংগ্রাম-গান।

অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে ॥
সময় হয়েছে নিকট এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।

পট পরিবর্তন

আবার সভা বসেছে। পড়ো বাড়ী। জমাট আঁধার। বেড়ার গায়ে ধোঁয়াটে হ্যারিকেন। থম্‌থমে সব মুখ। ছম্ ছম্ করে গা। বেড়ার উপর ছায়া কালো কালো।

সারথী আজ অনেকটা শান্ত। ধীর স্থির। নির্জন ঘরে বন্দী হলেও সুবল সাধু প্রাণে বেঁচে আছে। আর তাঁকে দিয়ে সরকার মশায়ের যখন ভবিষ্যত প্রয়োজনও রয়েছে, তখন খুব কষ্টেও তাকে রাখা হয় নি। আপাততঃ সারথীর কাছে এই যথেষ্ট সান্ত্বনা। তার উপর সন্ধ্যার গাড়ীতে যখন রণধীর এসে পড়েছে, তখন সুবল সাধুর উদ্ধারের ব্যবস্থাও একটা-কিছু হবেই। এ-ও সারথীর তথা অন্য সকলেরই বিশ্বাস। রণধীর সরকার মশায়ের চোখের মণি। রণধীরের আব্দারে অনেক কিছুই হতে পারে। সুবল সাধুর মুক্তি তো সহজ ব্যাপার।

অতএব সহজভাবেই সভার কায সুরু হল। আগেই ঠিক ছিল সেবাব্রতই হবে সভার প্রধান বক্তা। গত রাতের নিতাই পাল সংক্রান্ত ব্যাপার প্রকাশ করা হবে না। অথচ সরকার

মশায়ই যে সুবল সাধুকে আটক রাখার মূলে এ-কথা আকারে-ইংগীতে প্রমাণ করে রণধীরকে উত্তেজিত করতে হবে। এর জন্যে চাই সার্থক বক্তা। কথা বলবার মুন্সিয়ানা। সে-কায সেবাব্রতকে দিয়েই ভাল হবে। তাই সারথী এ-ব্যবস্থা করেছে।

ঘটনার একটা সংখিপ্ত আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে সেবাব্রত বলল : তোমরাই বিবেচনা করে দেখ, এই সব শুনে স্বভাবতই কি মনে হয় না যে, সুবল সাধুর নিরুদ্দেশের মূলে রয়েছে ঘর-পোড়ার মামলা ও তার সাক্ষী ? এ-কথা মনে করা কি অসংগত যে, নিতাই পালের চক্রান্ত এতে পূরামাত্রায় বর্তমান ? আর এও কি ঠিক নয় যে কোন শক্তিশালী লোকের সমর্থন না থাকলে নিতাই পালের মত ভীতু লোকের পক্ষে একটা মানুষকে জলজ্যান্ত উধাও করে দেওয়া অসম্ভব ?

কথাটা খচ্ করে রণধীরের কানে বিঁধল বিষাক্ত শায়কের মত। এ যে তার দাদুর বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ। ওর মনে পড়ল আর একটি অভিযোগের তীক্ষ্ণ স্বর : সাইলক দি য়্যু। কিন্তু এ যে ভীষণতর। নরহত্যার অভিযোগ।

রুষ্ট কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল রণধীর : তুমি কি বলতে চাও সেবা যে, আমার দাদুই এ-কায করিয়েছেন নিতাই পালকে দিয়ে।

সেবাব্রত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল : না না, তা আমি বলতে চাই না। তিনি কেন এ-সবে হাত দেবেন। আমি বলছিলাম কি—বলছিলাম যে—কোন শক্তিমান—

কথা বলে উঠল সারথী : আচ্ছা রণু, দাদুর পক্ষে এ-কায কি একেবারেই অসম্ভব বলে তুমি মনে করো ?

রণধীর জবাব দিল : শুধু আমি মনে করি? তুমিও কি মনে করো না রথীদা? তাঁর স্নেহের দয়ার পরিচয় কি তুমি পাও নি?

: পেয়েছি রণু, পেয়েছি। ধন-সম্পত্তি ও ক্ষমতার আওতায় যারা মানুষ, তাদের মধ্যে যে এমন স্নেহশীল মানুষ থাকে, তা আমি দাদুকে না দেখলে বুঝি বিশ্বাসই করতাম না কোন দিন। কিন্তু তার সংগে তো এর কোন সম্পর্ক নাই। সে-রূপ তোমার দাদুর ব্যক্তিগত রূপ। তোমার-আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ বলেই সারা দুনিয়াটাকেই তিনি স্নেহ করবেন, ভালবাসবেন,—তার কি কথা আছে? বাইরের জগতে তো তিনি দাদু নন। সেখানে তিনি সম্পত্তির মালিক, শক্তির অধিকারী। সেখানে জগতের সংগে তাঁর স্বার্থের সম্পর্ক, মর্যাদার হানাহানি, অহংকারের সংঘাত। জমিদারীর মান বাঁচাতে তিনি ভিটেবাড়ীর প্রজা এক অসহায় বৈরাগীকে লুকিয়ে ধরে এনে আটক করে রাখবেন, এতে আর আশ্চর্য কি? তাঁর রক্তে তো এরি নির্দেশ। এই তো তাঁর স্বভাব-ধর্ম।

রণবীর হতবাক। যুক্তিহীন। সারথীর মুখে একি কথা! মনে পড়ল, বাড়ী পৌঁছেই দাদুকে ও জিজ্ঞাসা করেছিল সারথীর কথা। দাদু কোন জবাব দেন নাই। নীরবে চলে গিয়েছিলেন অন্য কাযে। তবে কি সত্যি সারথী ও দাদুর মধ্যে এই ধরণের কোন কথা হয়েছে? সত্যি কি তবে দাদুর পক্ষে এ-কায সম্ভব?

নিজের মনের কাছেই রণধীর মন খুলে 'না' বলতে পারল না। চোখের সামনে কি কতদিন ও দেখে নাই, কাচারী বাড়ীতে কত অসহায় প্রজার লাঞ্ছনা? নিজের কানে শোনে নাই, কত

মিথ্যা মামলার ষড়যন্ত্র ? দাত্বর কণ্ঠে কত দাংগা-হাংগামার নিষ্ঠুর আদেশ ?

তবু মন যে মানে না। দাত্বর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ও কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারে না। রণধীর অভিমান-ভরা গলায় শুধাল : আচ্ছা রথীদা, তুদিন পরে আমিও তো হব এই সম্পত্তির মালিক ; তুমি কি মনে কর সে-দিন আমিও এ-সব কায করব অনায়াসে ?

মৃত্ব হাসল সারথী : নিশ্চয় করবে। কারণ সেদিন তুমি তো আজকের রণুভাই থাকবে না, সেদিন তুমি হবে সরকার বাড়ীর তরুণ জমিদার। জমিদারী রক্ষাই হবে সেদিন তোমার প্রধান কর্তব্য, মানুষের কল্যাণ সাধন নয়।

উচ্ছ্বসিত গলায় প্রতিবাদ করল রণধীর : না না, তুমি যা বলছ তা সত্য নয়। আমিই প্রমাণ কবে দেব সে কথা। জমিদার হলেই সে অমানুষ হয় না। যে হয় সে এমনি হয়। অবস্থা কখনো মানুষের আত্মাকে বদলে দিতে পারে না।

সারথীর কণ্ঠে মৃত্ব অবজ্ঞা : বেশ, সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায়ই আমরা রইলাম। কিন্তু সে-প্রশ্ন আপাতত থাক্। আমাদের সভার কথাই এবার চলুক। বল্‌রে সেবা, কি তোর প্রস্তাব আজকের সভায় ?

বাধা দিল রণধীর : না, প্রস্তাবের কোন দরকার নাই। আমি ভার নিচ্ছি, এখনি সুবল সাধুকে এনে হাজির করব তোমাদের সামনে। কিন্তু তার আগে এও তোমাদের বলে রাখছি ভাইসব, সত্যি যদি সুবল সাধুর নিখোঁজের সংগে দাত্বর কোন সম্পর্ক না থাকে, তা হলে 'জয়রথে'র সংগে আমার সম্পর্কও শেষ।

সারথী শুধাল : পারবে তুমি সুবলদাকে উদ্ধার করতে ?

দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিল রণধীর : হ্যাঁ, দাদু যদি তাকে আটক করে থাকেন। আর এও বলি, দাদুর হাত থেকে যদি এই নিরীহ ভাল মানুষটিকে মুক্তি না দিতে পারি, তাহলে সরকার বাড়ীর জমিদারী ভোগও আমার এখানেই শেষ।

রণধীর উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর হন হন করে বেরিয়ে গেল অন্ধকারের বুক চিরে। রথীবৃন্দ স্তব্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে সেদিকে চেয়ে রইল।

সরকার বাড়ী। দোতলার টানা বারান্দা। ঘরের উজ্জ্বল আলো দরজা জানালার ফাঁকে বারান্দায় পড়েছে কাটা কাটা হয়ে। আঁধারের বুকে আলোর ক্ষত-চিহ্ন যেন।

অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন সরকার মশায়। চোখে মুখে তীব্র উত্তেজনা। মাথার মধ্যে জমিদারী কূটকৌশলের ভূতের নৃত্য।

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল রণধীর। উত্তেজিত গলায় ডাকল : দাদু—

সরকার মশায় থম্‌কে বললেন : চিঠি নাই পত্র নাই, এমন হঠাত কেন যে তুই বাড়ী চলে এলি, তা বুঝলাম না। যাক্, এখন আমি বড় ব্যস্ত। ঘরে যা। পরে শুনব সব কথা।

রণধীরের গলা প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় : একটা কথা আমি এখনই বলব।

সরকার মশায় বিস্মিত হলেন, শুধালেন : বল্, কি জরুরী কথা তোর?

ঢোক গিলে বলল রণধীর : সুবল সাধু কোথায় দাদু ?

উদ্যত-ফণা সাপ চোখের সামনে দেখে যেন আঁতকে উঠলেন সরকার মশায়। কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন: সে খোঁজে তোর কি দরকার রে?

: আছে দরকার। বলো সুবল সাধু কোথায়?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থেকে সরকার মশায় বললেন: এরি জন্যে বুঝি তুই কলকাতা থেকে হঠাত বাড়ী এসেছিস, কেমন?

রণধীর মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। একটু পরে প্রশ্ন করলেন সরকার মশায়: আমিই যে সুবল সাধুকে লুকিয়ে রেখেছি, সে-কথা কে তোকে বলল?

ভয়ে ভয়ে জবাব দিল রণধীর: বলে নাই কেউ। ওরা সবাই তাই মনে করছে যে—

: কে মনে করছে? সারথী? কেমন?—সহসা অভিমানে সরকার মশায়ের গলা ভারী হয়ে উঠল: তা মনে করবে না? তাকে যে বড় ভালবেসেছিলাম, গরীবের ছেলেকে এনে রাজার হালে রেখেছিলাম, তার শোধ তুলবে না?

সংগে সংগে রণধীর বলে উঠল: রাজার হালে থাকতে সে চায় না। রাজা-জমিদারকে রথীদা মনে প্রাণে ঘৃণা করে।

তিক্ত কণ্ঠে বললেন সরকার মশায়: তাই বুঝি তুমিও রথীদার দলে নাম লিখিয়ে আমার সাথে লড়তে এসেছ, কেমন?

রণধীর বুঝল কথার স্রোত খারাপ দিকে মোড় নিয়েছে। ও তাই চুপ করল। একটু ভেবে সরকার মশায়কে শান্ত করবার জন্যে বলল: তুমি আমাকে বিশ্বাস করো দাদু, সত্যি বলছি একথায় আমি বিশ্বাস করি নাই। তাইতো ওদের ফেলে রেখে এক দৌড়ে

তোমার কাছে ছুটে এসেছি। বলো না দাদু, সত্যি তুমি এ ব্যাপারের কিছুই জানো না। আমি স্পষ্ট করে ওদের শুনিয়ে দিয়ে আসি।

একটি সরল কিশোরের এই দৃঢ় বিশ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে সরকার মশায়ের নিজেকে বড়ই ছোট মনে হতে লাগল। অহংকার মাথা তুলে দাঁড়াল। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি গর্জে উঠলেন: না, কিছুই তোমাকে বলতে হবে না। ওরা ঠিকই বলেছে। আমিই আটকে রেখেছি সুবল সাধুকে, আমার কথা অমান্য করবার অপরাধে।

হতাশায় ভেঙে পড়ল রণধীর: তুমি? তুমি করেছ এ-কায?

উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন সরকার মশায়: হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি করেছি। অবাধ্য প্রজাকে শাস্তি দিয়েছি। দিতে হয়। কিন্তু আমি ভাবছি, সে কথা সারথী জানল কেমন করে?

সরকার মশায় অবরুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করতে লাগলেন: কেমন করে? কেমন করে সে জানল যে আমি এর মধ্যে আছি? জেনেছে সে নিশ্চয়। নইলে আমার কাছে কেন সে আসবে সুবল সাধুর খবর নিতে? কেন অবহেলে ছিঁড়ে ফেলবে এ-বাড়ীর স্নেহ-বন্ধন? কেন আবার তোকে পাঠাবে ঘর-সন্ধানী করে? কিন্তু কেমন করে সে জানল সব কথা?

সহসা থেমে গেল সরকার মশায়ের দ্রুত পদক্ষেপ। স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়ালেন। চোখে মুখে ঝড়ের পূর্বাভাষ। অস্পষ্ট হিংস্রকণ্ঠে বলে উঠলেন: বুঝতে পেরেছি। আমি বুঝতে পেরেছি। এ-কায ওই নেমকহারাম ছোটলোক ব্যাটা নিতাই পালের। সারথীর চোখ রাঙানীতে ভয় পেয়ে ব্যাটা সব তাকে বলে দিয়েছে। কেমন কি না?

রণধীর সভয়ে জবাব দিল : না না। নিতাই পালের কথা তো রথীদা কিছু বলে নি। তাছাড়া, সঠিক ওরা কিছু জানেও না। সবই ওদের অনুমান মাত্র। নিতাই পালের কোন দোষ নাই দাদু।

গর্জে উঠলেন সরকার মশায় : চুপ করো। তোমার বুদ্ধি নিয়ে চলবার দিন আমার আজো আসে নি। সারথীর মত তুমিও আমাকে ওল্ড্ ফুল মনে করতে পার। কিন্তু আমি তা নই। আমার চোখে আজো ছানি পড়ে নি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এ নিতাইর কায। তাই আজ ও আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারে নাই। তাই ওর চোখে আজ দেখেছি আতংকের ছায়া। নেমকহারাম বেইমান—

সরকার মশায়ের কণ্ঠে লাগল প্রতিহিংসার ছোঁয়াচ : না, এ বেইমানকে বিশ্বাস নাই। নেমকহারামীর শাস্তি ওকে দিতেই হবে।

বলতে বলতেই সরকার মশায় ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। অজ্ঞাত আশংকায় রণধীর তাঁকে অনুসরণ করল।

পালংকের শিওর থেকে সরকার মশায় বন্দুকটা টেনে নিলেন। সশব্দে বাটটা ভেঙে একটা কার্তুজ তাতে পুরলেন। চাপা গলায় বললেন : একবার যখন বিশ্বাস ভেঙেছ, আর তোমাকে বিশ্বাস নাই। আমার অনেক কীর্তির সাক্ষী তুমি। তোমার শাস্তি মৃত্যু।

পিছন হতে চেঁচিয়ে উঠল রণধীর : কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

: চুপ্। আমি যাচ্ছি বেইমানীর শাস্তি দিতে। তুই চলে যা এখান থেকে।

: না, আমি যাব না। আগে বলো তুমি কোথায় যাচ্ছ বন্দুক নিয়ে ?

: রাবণ ঘরে।

রণধীর সবিস্ময়ে তার প্রতিধ্বনি করল : রাবণ ঘর?

: হ্যাঁ, সরকার বাড়ীর গুপ্ত গারদ রাবণ ঘর। নিতাই পাল একটু আগেই সেখানে গেছে সুবল সাধুর তদারক করতে। ভালই হয়েছে। এই নিতাই পালের কূট চক্রে বহু হতভাগ্যের প্রাণ রাবণ ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে মিশে আছে। তাদের ক্ষুধিত আত্মা আজ পরিতৃপ্ত হবে। আনন্দে তারা অট্টহাসি হাসবে।

সরকার মশায় উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন বিকৃত উল্লাসে। প্রকাণ্ড শয়ন ঘর গম্‌-গম্‌ করে উঠল।

এগিয়ে এসে বাধা দিল রণধীর : তোমার পায়ে পড়ি দাদু, এখন তুমি সেখানে যেও না, তোমাকে আমি যেতে দেব না।

: তবে তুমি দেখতে চাও আমার চরম অপমান? আমার শাস্তি?

: তোমার শাস্তি?

: শোন তবে। একটা জমিদারী চালানো শুধু টাকার গদীতে বসে থেকে আরাম করা নয়। বহু ন্যায় কাযের সংগে জীবনভোর বহু অন্যায় আমাকে করতে হয়েছে। কখনো ইচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায়—নিজের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। আমার সেই সব পাপ কাযের সাক্ষী—এক এই নিতাই পাল, আরেকজন এ-দেয়ারের নামকরা লেঠেল অক্রুর সর্দার।

সরকার মশায় চুপ করলেন। অতীতের বহু অন্যায় কার্যের স্মৃতি বুঝি ভীড় করেছে মনের পটে। শিউরে তিনি বলে উঠ্‌লেন : সেই নিতাই পাল যখন সামান্য একটা ছেলের হুমকীতে বিশ্বাস

ভেঙেছে, তখন কাল যে সে টাকার লোভে হাসারার চৌধুরীদের হাতে হাত মিলিয়ে আমার হাতে হাত-কড়া পরাবে না, তা কে বলতে পারে।

রণধীর আতংকিত হয়ে উঠল : বলো কি? তোমাকে জেলে পাঠাবে?

সরকার মশায়ের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি : শুধু জেলে নয়, দরকার হলে ফাঁসি-কাঠেও পাঠাতে ছাড়বে না। কিন্তু সাতপুরুষের জমিদারী রক্ত আমার বুকে। সে-পথ বন্ধ করতে আমি জানি। সরে যাও।

রণধীরকে সরিয়ে দিয়ে বাঁ-হাত দিয়ে তিনি পিছনের দেয়ালের ভেজানো দরজাটা সশব্দে খুলে ফেললেন।

রাবণ ঘর।

এক-তলারও কিছুটা নিচে একখানি মাঝারী ধরণের কুঠরী। দেয়ালে দরজা-জানালা নাই। উপরে কয়েকটা ঘুলঘুলি আছে। কিন্তু আলোর পথ তাতে রুদ্ধ। ঘরের চারদিকে শিরশিরে একটা বোবা অন্ধকার ছড়ানো। এককোণে কুলুংগীতে একটা মাটির দীপ। তারি অস্পষ্ট আলোয় ঘরখানির একটা প্রেতরূপ চোখে পড়ে।

ছোট তক্তপোষের উপর সুবল সাধু বসে আছে। অনাহার অনিদ্রায় শীর্ণ চেহারা। চোখে কিন্তু নাই ভয়ের লেখা। ঠোঁটের মৃদু হাসির রেখাটি তবু লেগেই আছে।

অর্ধভুক্ত ভাতের থালা সামনে পড়ে আছে। পাশ থেকে নিতাই পাল বলল : ভাল করে ভেবে দেখ সাধু। একে তোমার মনিব, তায় গাঁয়ের মাথা। তোমার একটা কথার দায়ে তাঁর তালগাছের মত উঁচু মাথাটা মাটিতে নুয়ে পড়বে, সেটা কি ভাল?

ধীর গলায় সুবল সাধু বলল : বার বার কেন বিরক্ত করছ পাল মশায় ? বলেই তো দিয়েছি একবার, মিছে সাক্ষী আমি দিতে পারব না।

: কিন্তু এ জিদের ফল কি ভাল হবে সাধু ?

মৃদু হেসে বলল সুবল সাধু : মরার বাড়া তো আর গাল নাই পাল মশায়। তোমাদের হাতে যখন পড়েছি তখন সহজে যে রেহাই পাব না তা জানি। কিন্তু তা বলে তিনকাল কাটিয়ে শেষে একটা মিছে কথা কয়ে আমি গোঁসাইর চরণ-তরী হারাতে পারব না।

নিতাই পাল উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল। সিঁড়িতে ক্রুদ্ধ পদ-শব্দ শুনে চমকে ফিরে চাইল। রুদ্র মূর্তিতে ঘরে ঢুকলেন সরকার মশায়। হাতে বন্দুক।

নিতাই পালের বুক ধড়াস্ করে উঠল।

সরকার মশায় হুংকার ছাড়লেন : নিতাই—

কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে নিতাই পাল বলল : হুজুর—

: তরুণ তাজা বাঘের থাবায়ই শক্তি বেশী। বুড়ো বাঘ আর ঘাড় মটকাতে পারে না—না ?

: হুজুর—

: সারথীকে সব তুমি বলে দিয়েছ ? বলেছ যে আমিই সাধুকে আটক করিয়েছি ?

: হুজুর—

: ও সব যাত্রা রাখো। বলো সত্যি কি না ?

: না বললে আমাকে মেরে ফেলত হুজুর।

নির্মম হাসি হেসে উঠলেন সরকার মশায় : ছায়ার মত সাথে সাথে থেকেও তুমি বনমালী সরকারকে চিনতে পার নি নিতাই। আমার জন্যে মরলে তোমার চিতায় আমি তাজমহল গড়ে দিতাম।

ভরসা পেয়ে নিতাই পাল বলল : হুজুর, মা-বাপ –

সরকার মশায়ের ঠোঁটে ব্যংগের হাসি : হুঃ, ছেলের কায খুব করেছ। পুন্নাম নরকের পথটা যাতে পরিষ্কার হয়, তারি ব্যবস্থা এখন করছি। ইষ্টনাম স্মরণ করো।

সরকার মশায় বন্দুক তুললেন। বাধা দিল রণধীর। নিতাই পালকে আড়াল করে সামনে যেয়ে দাঁড়াল : তার আগে তুমি আমাকে মেরে ফেলো দাদু। আমার চোখের সামনে তোমাকে আমি মানুষ মারতে দেব না।

এ-বাধা অনতিক্রমণীয়। নিরুপায় হয়ে সরকার মশায় বন্দুকের মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির পাশে। সুবল সাধুর পিঠে হাত দিয়ে বললেন : তোমার রথীভাইকে বলো সাধু, তার শক্তিকে আমি বাহাদুরী দিলাম। একটা দুগ্ধপোষ্য ধনীর দুলালকে সে মৃত্যুঞ্জয় করে গড়ে তুলেছে। তাকে আরো বলো, জমিদার হিসাবে কিন্তু তাকে আমি ক্ষমা করে গেলাম না। আমার সাতপুরুষের জমিদারীর ভিতে সে ফাঁটল ধরিয়েছে। দাদাভাইকে কেড়ে নিয়েছে আমার কোল থেকে।

বলতে বলতে সরকার মশায়ের গলার স্বর কেমন বদলে গেল। মুখে চোখে ফুটে উঠল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। বন্দুকের নাল ঘুরিয়ে নিজের গলায় ঠেকালেন।

ভয়ার্ত গলায় কেঁদে উঠল রণধীর : কি করছ তুমি দাদু?

অভিমানক্ষুব্ধ গলায় সরকার মশায় জবাব দিলেন : ঠিকই করছি। আত্মহত্যা। আজ তোমার আর আমার জাত আলাদা। নিজেকে বাঁচাতে আমি অন্যের খুলি লক্ষ্য করে বন্দুক তুলি, তুমি সে-বন্দুকের সামনে বুক পেতে দাও। তোমার প্রসংশা করি। আশীর্বাদ করি। কিন্তু তোমার পথে চলতে আমি পারব না। আমার জাত আলাদা। গলায় সাপ জড়িয়ে প্রাণে বেঁচে থাকা আমার ধাতে সইবে না। ওই বিশ্বাসঘাতক বেইমানকে চোখের সামনে রেখে জীয়ন্তে মরে থাকতে আমি পারব না।

নিতাই পাল সরকার মশায়ের পা জড়িয়ে ধরল : আমায় মাপ করুন হুজুর। বিশ্বাস করুন—

: বিশ্বাস ? তোমাকে বিশ্বাস ?—সরকার মশায় গর্জে উঠলেন। পরমুহূর্তেই চুপ করলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন : বিশ্বাস আর মাটির পাত্র একই রকম। বড় পবিত্র অথচ বড় নরম। একবার ভাঙলে তা আর জোড়া লাগে না। যাও এখান থেকে। ভয় কি ? দাদাভাই তোমার জামীন হয়েছে, তোমার পাশায় তো ছ'তিন নয়।

সুবল সাধুর দিকে চেয়ে বললেন : যাও হে সাধু। নতুন মনিব পেলে, এবার আর তোমার সক্ষী দেবার ভাবনা নাই।

সুবল সাধু শুধাল : আর আপনি কর্তামশায় ?

সরকার মশায়ের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি : আমি ? তোমাদের জগতে তো আমার আর জায়গা হবে না সাধু। আমি অন্ধকারের জীব। রাবণ ঘরেই আমার আস্তানা। যাও তোমরা সব এখান থেকে। এ আমার জমিদারী।

সুবল সাধু সহজভাবে বলল : বেশ। তাহলে দিন আপনার বন্দুকটা আমার হাতে।

ভ্রূকুটিকুটিল চোখ তুলে বললেন সরকার মশায় : কেন ? তোমার হুকুম নাকি ?

হাত জোড় করল সুবল সাধু : ও কথা বলবেন না কর্তামশায়। ওতে আমার গোঁসাই প্রভুর কোপ পড়বে। আমি প্রার্থনা করছি, বন্দুকটা আমার হাতে দিন।

নীরস হেসে বললেন সরকার মশায় : সবি কি আজ উল্টো হয়ে গেছে সাধু? নইলে প্রার্থনাও শোনায় হুকুমের মতো ?

মৃদু হেসে জবাব দিল সুবল সাধু : সত্যি কর্তামশায়, আমারো সবি কেমন নতুন লাগছে। মনে হচ্ছে, পুতুল নাচের যেন পট বদলানো হল। নইলে খুন জখমের কথা তো অনেক শুনেছি, কিন্তু দুধের ছেলেরা সব মানুষের প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের বুক পেতে দেয়, এ-কথা তো শুনি নি কখনো। কেমন কি না বলেন ?

বিদায় সারথী

সরকার মশায় চমকে চাইলেন সুবল সাধুর মুখের দিকে। প্রসন্ন হাসিতে সে-মুখ উদ্ভাসিত। সে কি নতুন দিনের আলো ?

সরকার মশায় মাথা নিচু করলেন। কি যেন ভাবতে লাগলেন নিবিষ্ট মনে। রাবণ ঘর উৎকণ্ঠ। সূচীস্তব্ধ।

সহসা সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভেসে এলো ভীত কণ্ঠস্বর : বাবা !

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরকার মশায় ফিরে দাঁড়ালেন। সবিস্ময়ে বললেন : এ কি ? বৌমা, তুমি এখানে ?

বিধবা পুত্রবধূ তেমনি শংকিত গলায় বললেন : ও-পাড়ায় আগুন লেগেছে বাবা, রণু কোথায় ?

সরকার মশায় বিরক্তকণ্ঠে বললেন : রণু আছে এখানেই। আগুন লেগেছে, এখনি নিভে যাবে। তার জন্যে তুমি এমন পাগলের মতো এখানে ছুটে এসেছ কেন বৌমা ?

পুত্রবধূ বললেন : সাংঘাতিক আগুন লেগেছে বাবা। ছাদ থেকে দেখলাম, ও-পাড়াটা লালে লাল হয়ে গেছে। রণুরা আবার গিয়েছিল ও-পাড়ায়ই সভা করতে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম। সিঁড়িতেই রামকরণ পাঁড়ের সাথে দেখা। রণুর কথা জিজ্ঞেস করতেই ও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কোন্ খোকাবাবু নাকি আগুন নেভাতে গিয়ে পুড়ে গেছে। শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল।

পাগলের মত আপনার ঘরে গেলাম। ঘরখানির পিছনের দরজা খোলা পেয়ে এখানে চলে এসেছি। আহা, কার বাছা না জানি আগুনে পুড়েছে বাবা।

রণধীর আপন মনেই বলল : আগুন নেভাতে গিয়ে পুড়ে গেছে! এ নিশ্চয় রথীদা। নইলে এত শক্তি আর কার হবে। আমি চললাম দাহু। তোমরা সবাই শিগগির এসো—

কেউ কিছু বলবার আগেই রণধীর তিন লাফে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল।

: এ্যাঁ, রথীভাই—আমার রথীভাই!—বলতে বলতে উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে গেল সুবল সাধু।

বাড়ী পুড়েছে নিতাই পালের। কারণ অজ্ঞাত। কারো কারো ধারণা, কানু মণ্ডলের গৃহদাহের এ পাল্টা জবাব। কেউ বলল, এতো সন্ধ্যে রাতে তা সম্ভব নয়। শীতের রাতে ঘরের মেঝেয় জ্বালানো আগুন থেকেই দুর্ঘটনার সূত্রপাত।

কারণ যাই হোক, ফল ফলেছে ভীষণ—মর্মন্তুদ। 'আগুন—আগুন' চীৎকার শুনেই 'জয়রথে'র রথীবৃন্দ ছুটে এল ঘটনাস্থলে। জল, বালতি, মই নিয়ে আগুন নেভাবার যথাসাধ্য চেষ্টা তারা করেছে। এমন সময় হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল নিতাই পালের স্ত্রী। তার ছোট ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরের পশ্চিম কোণে কাঠের সিন্দুকের উপর সে ঘুমিয়ে ছিল। বুঝি সেখানেই আছে।

আগুনের সর্পিল শিখা তখন ঘরখানাকে ঘিরে ফেলেছে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ক্ষুধাতুর শাঁ—শাঁ শব্দ।

মায়ের ক্রন্দনে অনেকেরই মন গলল, কিন্তু বুকে জোর এল না। সকলেই হায় হায় করতে লাগল।

সারথী মই বেয়ে জল ঢালছিল ঘরের চালে। এক লাফে সে নিচে নেমে এল। একটা ভিজে কাঁথা গায় জড়িয়ে ঢুকে গেল সেই জলন্ত অগ্নি-গর্ভে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা আচমকা ঘটে গেল। কেউ নিষেধ করবারও সময় পেল না। সেবাব্রত বজ্রাহতের মত হাঁ করে চেয়ে রইল।

আগুনে-ঝলসানো অর্ধমৃত একটা ছেলে নিয়ে বাইরে এসেই সারথী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। একটা কথাও বলতে পারল না।

ডাক্তার এল। ওষুধ চলল। সেবা হল। অশ্রুজল ঝরল। সেবাব্রত ও রণধীরের কান্নায় বনের পাখী গান ভুলল। সুবল সাধুর চোখের জলে সারথীর দগ্ধদেহ স্নান করল। সরকার মশায় নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বুকফাটা বেদনায়। তবু সারথী চলে গেল। পিছনে পড়ে রইল 'জয়রথ'। রইল হলুদবাড়ীর রথীবৃন্দ। পরদিন সূর্যাস্তের সংগে নিভে গেল সারথীর প্রাণ-প্রদীপ। বিদায় সারথী, বিদায়!

সরকার বাড়ীর পুকুর পাড়ে পাশাপাশি দুটো তালগাছ। তারই নিচে চন্দন কাঠের চিতা। মাঝখানে ঊর্ধ্ব বাহু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারথীর সমুন্নত দেহ। আগুনের লাল শিখা তাকে ঘিরে ঘিরে উঠছে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে—ঊর্ধ্বতর লোকে।

নগ্ন পদে চিতা প্রদক্ষিণ করছেন বনমালী সরকার। পিছনে সুবল সাধু। হাতে একতারা। শব্দহীন। তারো পিছনে রণধীর,

সেবাব্রত, স্বরাজ। দূরে দাঁড়িয়ে হলুদবাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা। অশ্রুসজল চোখ। শ্রদ্ধানত শির।

খোলা মাঠের হাওয়ায় চিতাগ্নির শিখা লক্ লক্ করে উঠল। সারথীর মর দেহ হল জ্যোতির্ময়। একখানি রক্তিম প্রণাম হয়ে আকাশে মিশে গেল। আকাশের তারায় তারায় রইল সারথীর মৃত্যু-স্বাক্ষর। সেবাব্রত কাতরকণ্ঠে আবৃত্তি করল সারথীর প্রিয় মৃত্যু-স্তব। সকলের কণ্ঠে উঠল তার সজল প্রতিধ্বনি.

কিসেরি বা সুখ ?
ক'দিনের প্রাণ ?
ওই উঠিয়াছে
সংগ্রাম-গান।
অমর মরণ রক্ত-চরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

—বিদায়—

"জয়হিন্দ"